নূতন আকারে — পুরাতন আকারে
২য় খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। — ১২শ খণ্ড, ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।

টাকীর বিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমীদার
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্,
মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩১০ — ২০৪/১২

শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত,
২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, সিমলা, কলিকাতা।

কলিকাতা,
১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট্ বাই লেনস্থ "কবিরত্ন" যন্ত্রালয়ে
শ্রীবিশ্বনাথ নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০৭

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয় ও লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
আয়ুর্ব্বেদ মতে "বিষ" পদার্থের নির্ণয় ও চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
স্বাভাবিক রোগবাধক শক্তি—ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি ...	১
মধুমেহ—ডাক্তার শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত—সি, সার্জ্জন, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ—	১
নাড়ীজ্ঞান লাভোপায়—শ্রীবসন্তকুমার প্রামাণিক	১
শরীরোৎপত্তি—	১
স্বাস্থ্যতত্ত্ব—একাল ও সেকাল—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন	১
ঔষধ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী—সম্পাদক	১
জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্য—ডাঃ শ্রীতারকনাথ দেব ...	১
বাঙ্গালার অবনতি ও বাঙ্গালার অধোগতি—সম্পাদক ...	১
মুষ্টিযোগে প্লীহা যকৃৎ চিকিৎসা—ডাক্তার শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী ...	১
বিসূচিকা চিকিৎসা—ডাক্তার এন্ মুখোপাধ্যায়	১
আয়ুর্ব্বেদে পরলোকতত্ত্ব—কবিরাজ শ্রীবারানসীনাথ বৈদ্যরত্ন ...	১
শরীরব্রণ এবং সদ্যব্রণের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ—কবিরাজ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন	১

নূতন আকারে পুরাতন আকারে

২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। ১২শ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

আয়ুর্ব্বেদ মতে "বিষ" পদার্থের নির্ণয় ও চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। "বিষ" পদার্থের নাম শ্রবণ মাত্র লোকে চকিত হইয়া উঠেন। তাহার বিশিষ্ট কারণও আছে। যদি বিষকে শোধনাদি দ্বারা ব্যবহার্য্য অর্থাৎ রোগ বিশেষের ঔষধের উপযুক্ত করা না হয়, তবে তাহা প্রাণনাশক পদার্থ। পৃথিবীস্থ চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, এই ত্রিবিধ পদার্থেরই অনেক অংশে, তীক্ষ্ণ, মধ্য ও মৃদু বিষ, অল্প মধ্য ও অধিক পরিমাণে আছে। এতাদৃশ ভয়ানক বিষ পদার্থের বিশিষ্ট জ্ঞান, সকলেরই প্রার্থনীয়; তাহার সন্দেহ নাই।

মনুষ্যজীবনের হিতকর ও অহিতকর পদার্থ সকলের বিশেষ নির্দ্দেশ, যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহাতে বিষের বিষয়ে যেরূপ উপদেশ আছে, আমরা এই প্রবন্ধে, তাহারই কিয়দংশ প্রকাশ করিব।

২। আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, "বিষ" প্রথমতঃ দুই প্রকার। যথা, স্থাবর ও জঙ্গম। অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থের যে যে অংশ বিষ, অথবা বিষাক্ত, তাহাদিগের নাম স্থাবর-বিষ। প্রাণিদিগের দেহে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষে যে বিষ থাকে, তাহার নাম জঙ্গম-বিষ। ১০ দশবিধ স্থানে, স্থাবর-বিষ, আর ১৬ ষোড়শবিধ স্থানে জঙ্গম বিষ থাকে।

প্রমাণ।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
দশাধিষ্ঠানমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং ষোড়শাশ্রয়ম্॥

(সুশ্রুত, কল্পস্থান, ২য় অধ্যায়)

স্থাবর-বিষ।

৩। বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ পদার্থের মূল, কন্দ, পত্র, পুষ্প, ফল, ত্বক্ (ছাল) ক্ষীর, (দুগ্ধবৎ রস) সার, নির্য্যাস, (আটা) এবং কতকগুলি ধাতুদ্রব্য (তামা প্রভৃতি ও হরিতাল প্রভৃতি) এই দশবিধ স্থান, স্থাবর বিষের আধার।

৪। কালকূট, বৎসনাভ (মিঠা-বিষ) হালাহল, ও মহাবিষ প্রভৃতি স্থাবর বিষ ৫৫ প্রকার আছে।*

জঙ্গম-বিষ।

৫। বিষধর জন্তুদিগের মধ্যে জন্তু বিশেষের দৃষ্টিক্ষেত্র, নিশ্বাস। দন্ত, নখ, মূত্র, পুরীষ (বিষ্ঠা) শুক্র, লালা, আর্ত্তবরক্ত, মুখ, সন্দংশ (সাঁড়াশীর ন্যায় অঙ্গ। যথা কাঁকড়ার দাড়)। বিশর্দ্দিত (? ?)। তুদাস্থি (হুল) শূক (সোঁওয়া যথা সোঁওয়া পোকার গাত্রস্থিত কাঁটার ন্যায় অংশ) এবং দেহস্থ পিত্ত ও প্রাণি বিশেষের শবদেহ। এই ১৬ ষোড়শ প্রকার স্থান, জঙ্গম-বিষের আধার।

জঙ্গম বিষধারী অসংখ্য সর্প ও কীটাদির মধ্যে সর্পই প্রধান রূপে গণনীয়। সর্প বিশেষই দৃষ্টিবিষ ও নিশ্বাসবিষ আছে। আর কীট জাতির মধ্যে লূতা অর্থাৎ মাকড়সাই দুশ্চিকিৎস্য বিষধারী।

আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যে সকল সর্পের দৃষ্টিক্ষেত্র ও নিশ্বাসে বিষ আছে, তাহারা পৃথিবীতে নাই। স্বর্গলোকেই থাকে। পৃথিবীস্থিত সর্পদিগের দন্তেই (বড়শীর ন্যায় দন্তে) বিষ থাকে অর্থাৎ দংশনকালে, সেই স্থানেই বিষ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিড়াল, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুদিগের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর নখ, মূত্র ও পুরীষাদিতে বিষের অবস্থিতি।

প্রমাণ।

দৃষ্টিনিশ্বাসবিষাস্তু দিব্যাঃ সর্পাঃ, ভৌমাস্তু দংষ্ট্রাবিষাঃ।

(সুশ্রুত, কল্পস্থান, ৩ অঃ)

---

* পৃথিবীস্থিত অসংখ্য ও নানাজাতীয় পদার্থের মধ্যে কোন্ গুলি "বিষ" এবং তীক্ষ্ণ, মধ্য, মৃদু ও সাধ্য, অসাধ্য প্রভৃতি তাহার বিভাগ, পূর্ণরূপে ও নিঃসন্দেহে উপদেশ দেওয়া কোনও মনুষ্যেরই সাধ্য নহে। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞানপূর্ণ পরম শ্রদ্ধাস্পদ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ভিন্ন, এতাদৃশ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপদেশ দানে সমর্থ, আর কিছুই নাই।

৬। বিষের স্বরূপ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বা গুণ।

স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ কৃত্রিমং চাপি যদ্ বিষম্।
সদ্যো ব্যাপাদয়েৎ তত্তু জ্ঞেয়ং দশগুণান্বিতম্॥

(সুশ্রুত ঐ)

অর্থ। স্থাবর অথবা জঙ্গম, অথবা কৃত্রিম (সংযোগ বিষ প্রভৃতি) যেরূপ বিষই হউক না কেন, বিশেষ চিকিৎসা ব্যতিরেকে, তাহা মনুষ্যদিগকে সদ্যঃ বিনাশ করে। বিষের ১০ দশটী গুণ অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্ম্ম আছে। তদ্দ্বারা বিষকে জানা যায়। যথা—

রুক্ষমুষ্ণং তথা তীক্ষ্ণং সূক্ষ্মমাশু ব্যবায়ি চ।
বিকাশি বিশদঞ্চৈব লঘ্বপাকি চ তৎ স্মৃতম্॥

(সুশ্রুত কল্পস্থান, ২ অঃ)

রুক্ষতা (স্নিগ্ধতার বিপরীত গুণ) উষ্ণতা (উষ্ণবীর্য্যতা) তীক্ষ্ণতা (মৃদুতার বিপরীত ধর্ম্ম) সূক্ষ্মতা (দেহ মধ্যে সূক্ষ্ম ছিদ্রেও প্রবেশ করিবার শক্তি) আশুকারিতা (সত্বর প্রাণনাশের শক্তি) ব্যবায়িতা (একবারে দেহস্থ যাবতীয় ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি আক্রমণ করিবার শক্তি)। বিকাশিতা অর্থাৎ বাতাদি দোষ পদার্থ রস রক্তাদি ধাতু, এবং মূত্র পুরীষাদি মলকে ক্ষয় করিবার শক্তি। বিশদতা (ধূলিবৎ অপিচ্ছিলতা) লঘুতা এবং অপাকিতা অর্থাৎ পাচক অগ্নিতে পরিপাক না পাওয়া।

৭। প্রতি গুণের কার্য্য।

তদ্রৌক্ষ্যাৎ কোপয়েদ্ বায়ুন্ ঔষ্ণ্যাৎ পিত্তং সশোণিতম্।
মানসং মোহয়েৎ তৈক্ষ্ণ্যাৎ অঙ্গবন্ধান্ ছিনত্ত্যপি॥
শারীরাবয়বান্ সৌক্ষ্ম্যাৎ প্রবিশেদ বিকরোতি চ।
আশুত্বাদাশু তদ্ধন্তি ব্যবায়াৎ প্রকৃতিং ভজেৎ॥
ক্ষপয়েচ্চ বিকাশিত্বাৎ দোষান্ ধাতূন মলানপি।
বৈশদ্যাদতিরিচ্যেত দুশ্চিকিৎস্যঞ্চ লাঘবাৎ॥
দুর্জ্জরঞ্চাবিপাকিত্বাৎ তস্মাৎ ক্লেশয়তে চিরম্॥

(সুশ্রুত ঐ)।

প্রতি-গুণের কার্য্য।

অর্থ—বিষপদার্থ, আপন রুক্ষতাগুণ দ্বারা বাতের রুক্ষতাগুণের বৃদ্ধিরূপ প্রকোপ করে। উষ্ণতাগুণ অর্থাৎ উষ্ণবীর্য্য দ্বারা পিত্তের ও রক্তের উষ্ণতাগুণের বৃদ্ধিরূপ প্রকোপ করে। তীক্ষ্ণতাগুণে মনকে মোহিত এবং দেহের সন্ধিস্থলকে শিথিল করে। সূক্ষ্মতাগুণে, দেহের সমুদায় সূক্ষ্মছিদ্রে প্রবেশ করিয়া সেই স্থলকে বিকৃত করে। আশুকারিতাগুণে সত্বর প্রাণনাশ করে। ব্যবায়িতা গুণে দেহস্থ যাবতীয় ধাতু, উপধাতু প্রভৃতিকে আক্রমণ পূর্ব্বক দেহের সহিত একীভূত হইয়া যায়। বিকাশিতা গুণে, দেহস্থ বাতাদি দোষ, রসরক্তাদি ধাতু, পুরীষমূত্রাদি মলকে ক্ষয় করে। বিশদতাগুণে, পিচ্ছিল ওজঃ ধাতুর শোষণ করাতে, রোগ দুশ্চিকিৎস্য হয়। লঘুতাগুণে, রোগের দুশ্চিকিৎস্যতা বৃদ্ধি হয়। অপাকিতাগুণে স্বয়ং পরিপাক পায় না।

৮। দূষীবিষ।

যৎ স্থাবরং জঙ্গম-কৃত্রিমং বা দেহাদশেষং যদনির্গতং তৎ।
জীর্ণং বিষঘ্নৌষধিভি র্হতং বা দাবাগ্নিবাতাতপ-শোষিতং বা।
স্বভাবতো বা গুণবিপ্রহীনং বিষং হি দূষীবিষতামুপৈতি॥

(সুশ্রুত, কল্পস্থান, ২ অঃ)

৯। সর্পদিগের শ্রেণী-বিভাগ।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পৃথিবীস্থ সর্পদিগের স্থূলতঃ ৫ শ্রেণী। যথা—

১। দর্ব্বীকর।—২ মণ্ডলী।—৩ রাজিমান্।—৪ নির্ব্বিষ।—৫ বৈকরঞ্জ।

প্রতি-শ্রেণীর বিভাগ ধরিলে, সর্ব্বসমেত ৮০ শ্রেণী যথা—

(১) দর্ব্বীকর ২৬।—(২) মণ্ডলী ২২।—(৩) রাজিমান্ ১০।—(৪) নির্ব্বিষ ১২।—(৫) বৈকরঞ্জ ৩ এবং বৈকরঞ্জোদ্ভব ৭। মোট ৮০ আশী শ্রেণী।

স্থূলতঃ ৫ শ্রেণী, আবার অতি স্থূলরূপে ৩ তিন শ্রেণীতে গণনীয়। যথা—

(১) দর্ব্বীকর।—(২) মণ্ডলী।—(৩) রাজিমান্। তাহাদিগের বাহ্য চিহ্ন এই—

১। যাহাদিগের ফণা আছে এবং সেই ফণাতে নিম্নলিখিত চিহ্ন থাকে। যথা—রথের অঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, অঙ্কুশ (হস্তিশাসনের শস্ত্র) স্বস্তিক যন্ত্র। এবং যাহারা শীঘ্রগামী। তাহারা দর্ব্বীকর।

২। যাহাদিগের গাত্রে, অনেক মণ্ডলাকার অর্থাৎ গোলাকার চিহ্ন থাকে। দেহ স্থূল, মৃদুভাবে গমন। কিন্তু যাহারা অগ্নি বা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তাহারা মণ্ডলী।

৩। যাহাদিগের শরীরে চাকচক্য এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ ভাগ নানাবর্ণ রেখা দ্বারা চিহ্নিত আছে, তাহারা রাজিমান্।

১০। সর্পদংশনের প্রকার ভেদ।

সর্পদিগের দংশনের প্রকার ভেদে, বিষপাতনের আধিক্য ও অল্পতা, এবং তদ্দ্বারা রোগের সাধ্যাসাধ্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ঐ দংশন ৩ তিন প্রকার। যথা—

(১) সর্পিত।—(২) রদিত।—(৩) নির্ব্বিষ।

উহাদিগের লক্ষণ।

১। যে দংশনে ১ বা ২ অথবা অনেকগুলি দন্ত বশাইবার গর্ত্ত আছে। ঐ গর্ত্তগুলি গভীর, কিন্তু আয়তনে অল্প। রক্তচিহ্নও অল্প। শোথ হইয়াছে। দংশন স্থান বিকৃত হইয়াছে। তাহার নাম "সর্পিত।"

ঐরূপ দংশনে অধিক বিষ পাতিত হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে।

২। যাহাতে নীল, পীত, শুভ্র ও অল্প রক্তবর্ণ রেখা হইয়াছে, তাহার নাম "রদিত" তাহাতে বিষ অল্প।

৩। যেরূপ দংশন হইলেও, রোগী ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ দৃষ্ট হয়। শোথ থাকে না। রক্ত, অল্পই দূষিত হয়। অথচ এক বা অনেক দন্ত পাতিত করিবার চিহ্ন অর্থাৎ গর্ত্ত থাকে, তাহার নাম "নির্ব্বিষ।"

এতদ্ভিন্ন, কোনও কোনও মনুষ্য এরূপ ভীরু যে, নিজ দেহে সর্পের দেহ স্পর্শ মাত্রই ভয়ে, তাহার বাত প্রকোপ হওয়াতে দেহ ফুলিয়া যায়। তাদৃশ রোগীকে "সর্পাঙ্গাভিহত" বলা যায়।

১১। সর্পদেহে বিষের স্থান।

লোকে মনে করিতে পা'রেন যে, সর্পগণ দংশন করিলেই দষ্টব্যক্তি বিষার্ত্ত হয়। অতএব, সর্পদিগের দন্তেই বিষ থাকে। অন্যত্র নহে।

কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে। মানব দেহে যেমন শুক্র পদার্থ সমস্ত দেহব্যাপী। শুক্রনিঃসারণ কালে সমস্ত দেহ হইতে শুক্র পদার্থ আসিয়া অগ্রে "কোষ" নামক যন্ত্রে সঞ্চিত হয়। পরে মেঢ্রপথে নিঃসৃত হয়। সেইরূপ সর্পেরও সমস্ত দেহে বিষ থাকে।

সর্পগণ কোনও জন্তুকে দংশন করিবার সময়, পুচ্ছ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত দেহকে কোঁচকাইতে থাকে। তাহাতে সর্ব্বদেহস্থিত বিষ আসিয়া, সর্পের মুখস্থিত বড়িশবৎ দন্তে সঞ্চিত হয়। পরে ঐ সর্প, আপন মুখ উন্নত ও বক্র করিয়া বড়িশাকার বক্র বিষদন্ত দ্বারা বিষ ঢালিয়া থাকে।

প্রমাণ।

শুক্রবৎ সর্ব্বসর্পানাং বিষং সর্ব্বশরীরগং।
ক্রুদ্ধানামেতি চাঙ্গেভ্যঃ শুক্রং নির্ম্মন্থনাদিব॥
তেষাং বড়িশবদ্ দংষ্ট্রাস্তাসু সজ্জতি চাগতম্।
অনুদ্‌বৃত্তা বিষং তস্মাৎ ন মুঞ্চতি চ ভোগিনঃ॥

(সুশ্রুত কল্পস্থান, ৩ অঃ)

যথা পয়সি সর্পিস্তু গূঢ়শ্চেক্ষৌ রসো যথা।
শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ ভিষগ্‌বরঃ॥

(সুশ্রুত)

১২। বিষের বেগ।

মনুষ্য দেহস্থিত রক্তাদির যে ৭ সাতটী কলা নামক আবরণ আছে, প্রকুপিত বায়ু-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহার একটীতে প্রবেশ ও ভ্রমণকে বিষের প্রথম বেগ কহে। ঐরূপে অপর কলাতে গমন ও তথায় ভ্রমণকে দ্বিতীয় বেগ কহে। এইরূপে বিষ পদার্থের ৭ সাত বেগ হইয়া থাকে।

প্রমাণ।

ধাত্বন্তরেষু যাঃ সপ্ত কলাঃ সম্পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তাস্বেকৈকামতিক্রম্য বেগং প্রকুরুতে বিষম্॥
যেনান্তরেণ হি কলাং কালকল্পং ভিনত্তি হি।
সমীরণেনোহ্যমানং তত্তু বেগান্তরং স্মৃতম্॥

(সুশ্রুত, কল্পস্থান, ৪ অঃ)

আয়ুর্ব্বেদে প্রতিপ্রকার বিষের প্রত্যেক বেগের বাহ্যলক্ষণ এবং পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট আছে।

১৩। বিষের চিকিৎসা বিবরণ।

আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে যে, সর্পবিষের শান্তিবিষয়ে দ্বিবিধ চিকিৎসার বিধান আছে।—(১) মন্ত্র চিকিৎসা।—(২) অগদ চিকিৎসা।

১৪। মন্ত্র চিকিৎসা।

মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অতি ভয়ানক বিষ পদার্থের গতিরোধ অথবা প্রতাপের হ্রাস অথবা ধ্বংস, অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইতে পারে। তাহার কারণ এই যে, বিদ্যমান সময়ে এমন কোনও মনুষ্যই দৃষ্ট হয় না যে, তিনি আর্য্যভাষা অথবা অনার্য্য ভাষাতে মঙ্গলসাধক বা অমঙ্গলসাধক যাহা কিছু আদেশ (আশীর্ব্বাদ কিংবা অভিশম্পাৎ) করিবেন, তাহার কার্য্য বাস্তবিকই হইবে। কিন্তু যোগ সাধনাদি দ্বারা বাক্‌সিদ্ধ ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন মহর্ষিগণের মুখোচ্চারিত এবং অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি মন্ত্র যে অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, ইহা একবারেই অবিশ্বাস্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ পরম প্রামাণিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপদেষ্টা নারায়ণাবতার ভগবান্ ধন্বন্তরি সেই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। যথা,—

বিষং তেজোময়ৈর্মন্ত্রৈঃ সত্যব্রহ্মতপোময়ৈঃ।
যথা নিবার্য্যতে ক্ষিপ্রং প্রযুক্তৈর্ন তথৌষধৈঃ॥

(সুশ্রুত, কল্পস্থান)

কিন্তু ঐ মন্ত্রের গ্রহণ, পূজাদি দ্বারা তাহার সংরক্ষণ, মন্ত্রের অন্তর্গত হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি বর্ণ সকলের যথাবিধান উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রয়োগ, সহজ ব্যাপার নহে। তথাহি,—

যে ব্যক্তি, স্ত্রী সংসর্গ, মদ্যপান, মাংস ভোজন পরিত্যাগ করেন,—অতি সংযমের সহিত পরিমিত আহার করেন—সর্ব্বদা পবিত্র আচারে থাকেন—কুশাসনে শয়ন করেন, তাদৃশ ব্যক্তিই মন্ত্র গ্রহণের অধিকারী।

প্রমাণ।

মন্ত্রাণাং গ্রহণং কার্য্যং স্ত্রীমাংসমধুবর্জ্জিনা।
জিতাহারেণ শুচিনা কুশাস্তরণশায়িনা॥
গন্ধমাল্যোপহারৈশ্চ বলিভিশ্চাপি দেবতাঃ।
পূজয়েন্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থং জপহোমৈশ্চ যত্নতঃ॥

(সুশ্রুত ঐ)

মন্ত্র চিকিৎসা অতি উপাদেয় হইলেও, যে হেতু মন্ত্রের উচ্চারণ, যদি যথাবিধি না হয়;—যদি কোনও স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের অন্যথা হয়, তাহা হইলে, মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। অতএব, অগদ অর্থাৎ বিষনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসাই সাধারণের সাধ্য ও অবলম্বনীয়।

প্রমাণ।

মন্ত্রাস্তু বিধিনা প্রোক্তা হীনা বা স্বরবর্ণতঃ।*
যস্মানসিদ্ধিমায়ান্তি তস্মাদ্ যোজ্যোঽগদক্রমঃ॥

(সুশ্রুত, ঐ)

১৫। মন্ত্রপ্রয়োগ ব্যতিরিক্ত সর্ব্বসাধারণ চিকিৎসা।

প্রথম অরিষ্টা বন্ধন।

যে কোনও সর্পের দংশনে, পাতিত "বিষ" রক্তের স্রোতে উর্দ্ধদিকেই গমন করে। ইহা জঙ্গমবিষের প্রকৃতি। সুতরাং শরীরের মধ্যে হস্ত অথবা পদের যে স্থানে দংশন হয়, তাহার চারি আঙ্গুল উপরিভাগে, রজ্জুস্থানীয় অল্প ওশার চর্ম্মের অথবা অতি দুশ্ছেদ্য অথচ কিছু নরম রেশমী কাপড়, অথবা তদভাবে সূতার কাপড়, তদভাবে কিছু নরম অথচ দুশ্ছেদ্য শণের কিংবা পাটের কোষা (পাক দেওয়া দড়ী নহে) দিয়া এরূপ বেষ্টন-পূর্ব্বক বন্ধন করা উচিত যে, তাহার উর্দ্ধদিকে রক্তের গতি বন্ধ ও তজ্জন্য বিষের গতিও বন্ধ হয়। ইহাকে অরিষ্টাবন্ধন কহে।

যাঁহারা বিষনাশক মন্ত্র জানেন, তাঁহারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঐ অরিষ্টাবন্ধন করিলে অধিক উপকার হয়।

ক্রমশঃ—

কবিরাজ শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* শাস্ত্রের বিধান এরূপ হইলেও, এক্ষণে অনেক পল্লীগ্রামে দৃষ্ট হয় যে, তথায় হাড়ী, মুচি প্রভৃতি অতি নীচ জাতীয় লোকে "রোজা" অর্থাৎ সর্পাঘাতের চিকিৎসক। তাহারা, তাহাদিগের শিক্ষিত মন্ত্র দ্বারাই অনেক সর্পদষ্ট ব্যক্তির আরোগ্য সাধন করিয়াছে। তাহাদিগের চিকিৎসাতে কিছু কিছু অগদের (গদ) প্রয়োগও দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারাই অনেকাংশে উপকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে যে কি গূঢ় রহস্য আছে, তাহা বোধগম্য হয় না।

স্বাভাবিক রোগবাধক শক্তি।

প্রত্যেক চিকিৎসকেরই বিদিত আছে যে, আমাদের শরীরে স্বাভাবিক রোগবাধক শক্তিই (Immunity) অসংখ্য রোগবীজ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার প্রধান সহায়। কারণ, এই শক্তির অভাব হইলেই আমাদের শরীর সামান্য হেতুতে নানা রোগের আগার স্বরূপ হইয়া থাকে। একটী ব্যাধিই নানা আকারে আমাদের শরীরে বিকাশ পাইতে পারে। আমাদের শরীরে রোগবাধক শক্তির লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারেই উক্তরূপ হইয়া থাকে।

উহার দৃষ্টান্ত এই যে, এক টিউবার্কেল ব্যাসিলাই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় শরীরে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। যথা, লুপ্স (চর্ম্মের টিউবার্কেল ব্যাধি), পট্স্ ব্যাধি, (মেরুদণ্ডের কেরিজ নামক ব্যাধি), ফুস্ফুসে টিউবার্কেল বা পাল্‌মোনারি থাইসিস্,—মেনিঞ্জিসে টিউবার্কেলযুক্ত ব্যাধি বা টিউবার্কিউলার মেনিনজাইটিশ,—সাধারণ টিউবার্কিউলোসিস্। শরীরে রোগবাধক শক্তি যে পরিমাণে কম হইবে, তদনুসারে এক রোগের বীজ, ভিন্ন ভিন্ন আকারে শরীরে প্রকাশ পাইবে। যখন ত্বকের নিম্নে টিউবার্কিলিন প্রয়োগ দ্বারা রোগবাধক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন লুপ্স রোগের টুবার্কেল ব্যাসিলাস জেনারেল টিউবার্কিউলোসিস্, উৎপাদন করিয়া থাকে। একই প্লেগ ব্যাসিলাস দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্লেগ রোগ হইয়া থাকে। যাহার রোগবাধক শক্তি অত্যন্ত প্রবল, সে ব্যক্তি, সাংঘাতিক টিউবার্কেল বা প্লেগব্যাসিলাই কর্ত্তৃকও আক্রান্ত হয় না।

স্বাভাবিক রোগ বাধক শক্তি নষ্ট হওয়ায় ভারতের দুর্ব্বল লোক সকল, ম্যালেরিয়া, ডিস্পেপসিয়া, প্লেগ প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগাক্রান্ত হইয়া যে কালকবলে পতিত হইতেছে, তাহাদের রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা চিকিৎসকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদ্যপি পল্লীগ্রামবাসী কৃষিজীবী প্রভৃতি লোকেরা ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ, নানাবিধ অন্ত্রের পীড়া প্রভৃতি রোগে কষ্ট না পায়, তবে জনাকীর্ণ সহরের দুরবস্থাও শীঘ্র বিনষ্ট হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে,—বীর্য্যের (শুক্রধাতুর) অপব্যয় নিবারণই নানাবিধ রোগবীজ হইতে রক্ষার প্রধান উপায়। জরাজীর্ণাবস্থা দূর করিবার জন্য ডাক্তার ব্রাউন সেফার্ড, টেষ্টিকেলের ইমলসন্ ইঞ্জেকসন্ দ্বারা যে আশ্চর্য্যজনক ফললাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া লেখক স্থির করিয়াছেন যে,—পুরুষের বীর্য্য অর্থাৎ শুক্রই রোগবাধক শক্তির প্রধান সহায়।

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড, প্যানক্রিয়াস প্রভৃতির ন্যায় পুরুষের টেষ্টিকেলেও (পুঃ কোষে) একটী স্বাভাবিক আভ্যন্তরিক সিক্রিসান আছে। পূর্ণ যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যদি কোনও জন্তুকে ক্যাষ্ট্রেটেড (খাসি) করা হয়, তবে ঐ সময় উপস্থিত হইলে, তাহার পুরুষজাতীয় সমুদায় পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতেই স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, টেষ্টিকেলের একটী বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা আছে। তাহা দ্বারা যৌবনকালে কতকগুলি পদার্থ সমুৎপন্ন হয় এবং শরীরে পুরুষোচিত পরিবর্ত্তন সকল প্রস্ফুটিত হয়। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ক্যাষ্ট্রেশন (অণ্ডকোষচ্ছেদন) দ্বারা মনুষ্যের সাহস এত কম হইয়া যায় যে, বন্দুক ব্যবহারকালে, প্রায়ই তাহার হস্ত ও শরীর কম্পিত হইয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে। মনুষ্যের ব্যাধিতে প্রফেসার ব্রাউনসেফার্ড যে জন্তুর টেষ্টিকেলের একষ্ট্রাক্ট ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা চিকিৎসক সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর্শনভ্যাল, টেষ্টিকেল হইতে যে তরল প্রয়োগরূপ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বহুমূত্র, নিউরেস্থেনিয়া, নিউরালজিয়া, কম্পন ও এট্যাক্সিরোগে উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা উত্তম রজোনিঃসারক। ধ্বজভঙ্গরোগে, বিশেষতঃ বয়সের আধিক্যজনিত অথবা অত্যন্ত অধিক ইন্দ্রিয়চালনা সমুৎপন্ন পুরুষত্বহীনতায় টেষ্টিকিউলার ফ্লুইড্ ইঞ্জেক্‌সন দ্বারা সহবাসশক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ হার্টের টনিক এবং ইহা দ্বারা হার্টের বিকৃত অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। হার্টসম্বন্ধীয় রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। লাইকার টেষ্টিকিউলারিস্ প্রস্তুত করিতে হইলে কোনও একটী জন্তুর (গিনিপিগের টেষ্টিশই প্রশস্ত) গ্লিসরিন সহ ম্যাসারেট করিয়া ফিলটার করিবার এবং তৎকালে ডাক্তার আর্স নভ্যালের প্রণালী অনুসারে কার্ব্বনিক এসিড সহ চাপ দিতে থাকিবে। ঐ টেষ্টিকেলের রসের মধ্যে পোয়েল স্থির করিয়াছেন যে,—স্পার্মিন বা টেষ্টিকিউলিন্ নামক কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট পদার্থ আছে। ঐ পদার্থের অক্সিডেশন ক্ষমতা উত্তেজিত করিবার গুণ অর্থাৎ শক্তি আছে। এই জন্য ইহা এনিমিয়া, ডায়াবেটিশ, ইউরিমিয়া রোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। লাইকার টেষ্টিকিউলারিশ এক কিউবিক্ সেন্টিমিটার হাইপোডার্মিকরূপে আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়। টেষ্টিসের মধ্যস্থিত স্পার্মিন্ নামক পদার্থ, কেবল যে, টেষ্টিস্ হইতেই পাওয়া যায়, এরূপ নহে। উহা ওভেরি প্যানক্রিয়াস ও ডিম ছাড়িবার সময়, মৎস্যের অণ্ড হইতেও পাওয়া যায়। পাইপ্যারিজিন নামক একটী পদার্থ সকল চিকিৎসকেরই জানা আছে। ইহা স্পার্মিনের অনুরূপ।

স্পার্ম্যাটিক ফ্লুইড়ে স্পার্মিন্ ফস্‌ফরিক্‌এসিড সহ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ইহা শরীরের একটী স্বাভাবিক উপাদান বলিয়া ইহার প্রয়োগে কোনও বিপদ নাই এবং চর্ম্মের নিম্নে ইন্‌জেকস্‌নরূপে ব্যবহারেও কোনও স্থানিক প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। পেশী মধ্যে এই ঔষধের ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। স্পার্মিনের বা পাইপারেজিনের ইউরেট দ্রব করিবার প্রবল ক্ষমতা আছে। ইহা সমপরিমাণ কার্ব্বনেট অভ্ লিথিয়ম অপেক্ষা ১২ ভাগ ইউরিক এসিড্ দ্রব করিতে পারে। অনেক চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ন্যূনকল্পে ৮ হইতে ১২ বার বার টেষ্টিকেল্ ফ্লুইড্ ইন্‌জেক্‌সন দ্বারা বেশ উপকার পাওয়া গিয়াছে।

উপরি উক্ত ঘটনার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছু এস্থলে বর্ণিত হইল, তাহা বিজ্ঞানবিৎ সমাজে কতক পরিচিত এবং ইহা যেন আধুনিক সমস্ত চিকিৎসকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

সকলেই জানেন যে, পূর্ণ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যদি কোনও জন্তুকে ক্যাষ্ট্রেটেড্ (খাসি) করা যায়, তাহা হইলে পূর্ণযৌবনকাল উপস্থিত হইলেও পুরুষজাতীয় অনেক চিহ্নাবলী তাহার শরীরে আর পরিস্ফুট হয় না। যে সকল জন্তুকে ক্যাষ্ট্রেটেড (খাসি) করা হয় নাই, তাহাদের যে পরিমাণ স্বাভাবিক সাহস ও উৎসাহ ক্যাষ্ট্রেটেড জন্তুর সে পরিমাণ কিছুতেই থাকে না। আর এক কথা এই যে, যে সকল জন্তুকে খাসি করা হয় নাই, তাহারা যদি অধিক মাত্রায় বীর্য্য (শুক্র) ক্ষয় না করে, তবে তাহারা, যাহাদিগকে খাসি করা হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা দীর্ঘতরকাল জীবিত থাকে।

টেষ্টিকেলের আভ্যন্তরিক নিঃস্রাবের উপরিই সাহস এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রাখর্য্য নির্ভর করে। উক্ত নিঃস্রাব, স্পার্ম্মাটিক ভেইন ও লিম্ফ্যাটিক দ্বারা শারীরিক রক্ত সঞ্চালনে প্রবেশ করে। ক্যাষ্ট্রেটেড (খোজা) মনুষ্যেরও সাহস এবং অধ্যবসায় অতিশয় কম। আমরা জানি যে,—প্যানক্রিয়াস তাহার নিজের আভ্যন্তরিক নিঃস্রাবক প্যানক্রিয়াটিক ভেন ও লিম্ফাটিক দ্বারা রক্ত স্রোতে প্রেরণ করে এবং ইহাই গ্লাইকোসুরিয়া নামক ব্যাধি জন্মাইতে দেয় না। এই নিঃস্রাবের অভাব হইলে, আর্টরিওল সকল এবং ক্যাপিলারি সকল ডাইলেটেড (প্রসারিত) হইয়া পড়ে। এই জন্যই প্যানক্রিয়াসজাত ডায়েবেটিশ (বহুমূত্র) রোগে অনেক স্থানেই অস্বাভাবিক লালবর্ণ হইয়া থাকে এবং, অধিক পরিমাণে অক্সিহিমোগ্লোবিন্ পোর্ট্যাল ভেন দ্বারা লিভারে প্রবেশ করিয়া অধিক পরিমাণে গ্লাইকোজেন্‌কে শর্করায় পরিণত করে।

শরীরে ঐরূপে অধিক পরিমাণে শর্করা অক্সিডাইজড্ না হইয়া সঞ্চিত হওয়ায় ইহাকে দ্রবীভূত অবস্থায় রাখিবার জন্য সদাই জল আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই জন্য সমস্ত সেনসারি স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ বহুমূত্র রোগে সদাই গাত্রদাহ হয়, বিশেষ ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়।

টেষ্টিকেল, প্যানক্রিয়াস এবং ওভেরির আভ্যন্তরিক নিঃস্রাব, ক্যাপিলারি এবং আর্টারিওল্ সকলকে অস্বাভাবিকরূপে ডাইলেটেড্ হইতে না দিয়া শরীরের অক্সিজেনকে নিয়মিত করিয়া রাখে। পেরিফেরির (অন্তী) রক্তবহানালী সকলের অস্বাভাবিক প্রসারণ ও দ্রুতগামী অন্অক্সিডাইজড্ রক্তস্রোত দ্বারা হার্টের উত্তেজন, এই উভয়ে মিলিয়া টেকিকার্ডিয়া উপস্থিত করে।

টেকিকার্ডিয়া, অস্বাভাবিক টিস্যুক্ষয় নির্দ্দেশ করে। যুবা ব্যক্তির শরীরে ঐ লক্ষণ দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি থাইসিস্ বা তাদৃশ কোনও ক্ষয়কারী রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

যদি রক্তের মধ্যস্থিত পোষণকারী, শরীরের সেল সকলকে আপ্লুত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকলে সঞ্চিত হইতে সময় না পায়, তবে ক্যাপিলারিতে রক্ত থাকায়, সেল সকলের কোন উপকারিতা নাই। সেল সকলের সেন্ট্রিপিট্যাল (যে শক্তিতে কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়) ও সেন্ট্রিফিউগ্যাল (যে শক্তি প্রভাবে কেন্দ্র হইতে বাহিরে যায়) নামক দুইটী ক্ষমতা আছে। সেন্ট্রিপিট্যাল শক্তি দ্বারা ইহারা রক্ত হইতে আপনাদের পোষণোপযোগী পদার্থ সকল আকর্ষণ করিয়া লয়। সেন্ট্রিফিউগ্যাল শক্তিদ্বারা তাহারা আপনাদের পরিত্যক্ত পদার্থ সকল নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যে মুহূর্ত্ত-কাল সেন্ট্রিপিট্যাল ও সেন্ট্রিফিউগ্যাল স্রোতদ্বয় স্থির থাকে, সেই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সেল সকল পুষ্ট হয়। টেকিকার্ডিয়া হইলে, সেল সকল দ্রুতগামী রক্তস্রোত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পোষণকারী পদার্থ সকলের উপকারিতা লাভ করিতে পারে না। সেল সকলের যথেষ্ট পরিমাণে পোষণোপযোগী পদার্থের অভাবে, টেকিকার্ডিয়াতে তাহাদের প্রোটোপ্লাজম্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে ইহা বিশেষ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বীর্য্য বা সিমেন্ অধিক নষ্ট হইলে টেকিকার্ডিয়া হইয়া থাকে ও অধিক উত্তাপ জন্মাইয়া থাকে। এই টেকিকার্ডিয়া ও অস্বাভাবিক তাপোৎপত্তি, মনুষ্যের খিট্খিটে স্বভাব ও স্নায়বীয় উগ্রতা জন্মাইয়া থাকে।

পুরাকালে হিন্দুরা ছাগ, কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তুর টেষ্টিকেলের উপকারিতা বেশ জানিতেন। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক প্রেস্ক্রিপশন্ দেখা যায়, যাহাতে অনেক জন্তুর টেষ্টিকেল ঘৃতে ভাজিয়া অথবা দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া

আছে। তাঁহারা জানিতেন যে, টেষ্টিকেলের আভ্যন্তরিক নিঃস্রাবের শরীর স্নিগ্ধকারিতা গুণ আছে। তাঁহাদের মতে বীর্য্যক্ষয়ে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দ্বারা টিস্যু নষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ঋতু বন্ধ হইলে, হিষ্টিরিয়া, অস্বা-ভাবিক তাপোৎপত্তি ও হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ীর চাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে। অতএব ঋতু-শোণিত যদি শরীর হইতে বহির্গমন করিতে না পারে, তবে শরীরে অধিক তাপোৎপত্তি হইয়া থাকে। কোষচ্ছেদন ও অধিক স্ত্রীসংসর্গ এই উভয়ের একই ফল।

অধিক স্ত্রীসংসর্গের পর শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন উপস্থিত হয়। পূর্ণাবস্থায় কাহারও অণ্ডকোষ চ্ছেদন করিলে মনশ্চাঞ্চল্যাবস্থায় সেইরূপ কম্পন হইয়া থাকে। অধিক বীর্য্যস্খলন, যেরূপ মনঃসংযোগের প্রবল অন্তরায় এরূপ প্রবল অন্তরায় আর কিছুই নাই।

সকলেই জানেন যে, বীর্য্যপাতের অব্যবহিত পরক্ষণে শরীরের বল, স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইয়া পড়ে। উষ্ণপ্রধান দেশে বীর্য্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম হয় ও শ্বাস-নলীর (বিশেষতঃ দুর্ব্বল ব্যক্তির) মিউকস্ মেম্ব্রেণে প্রচুর স্রাব হইয়া থাকে। গায়কেরা, অধিক বীর্য্যক্ষয়ের পর, তাহাদের স্বরমাধুর্য্যের বৈলক্ষণ্য অনুভব করে। সিমেন্ শরীরে আবদ্ধ থাকিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে। স্ত্রীসহবাসের পর টিস্যুমেটাবলিজম্ হওয়ায়, অধিক টিস্যু নষ্ট হয় এবং সেই ক্ষতিপূরণার্থে অনেক সময় ক্ষুধানুভব হইয়া থাকে। পরন্তু অধিক বীর্য্যক্ষয়ে ক্ষুধা নষ্ট হয় ও সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা অনুভব হয়। সোয়েট্ গ্লাণ্ড (ঘর্ম্মগ্রন্থি) সকল হইতে, অধিক বীর্য্যক্ষয়ের পর সচরাচরই প্যারালিটিক সিক্রিশন হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অধিক স্ত্রীসহবাসজন্য লোকের থার্ম্মোজেনেটিক (তাপোৎপাদক) কেন্দ্র উত্তেজিত হয়। অধিক তাপোৎপাদন হইলে, লোকে ক্ষয়কারী রোগে ও রক্তস্রাবী রোগে ভুগিতে থাকে। এরূপ লোকের টেকি-কার্ডিয়া (হার্টের দ্রুতগতি) হইয়া থাকে। পরিপাক শক্তির দৌর্ব্বল্য পিত্তাধিক্য এবং টেকিকার্ডিয়া থাইসিসের পূর্ব্বলক্ষণ হয়।

অধিক বীর্য্যক্ষয় যে, মনুষ্যকে শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একান্ত মনঃসংযোগ করিবার ক্ষমতা হ্রাস হইলে, লোকের স্মরণশক্তির হ্রাস হয়। অধিক বীর্য্যক্ষয় হইলে, লোকের সিম্প্যাথেটিক্ নার্ভাস্ সিষ্টেমের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। অধিক সহবাসজন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিরই সিম্প্যাথিটিক্ ও সেরিব্রোস্পাইনাল্ নার্ভাস্ সিষ্টেম সকলের কার্য্যের অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধিক স্ত্রীসংসর্গ যখন আমাদের ডিজেস্টিভ ক্ষমতা (পাচকশক্তি) নষ্ট করে ও

আবশ্যক যন্ত্র সকলের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায় এবং শরীর ক্ষয় করে, তখন কেবল অধিব
স্ত্রী-সংসর্গ হইতে বিরত হওয়াই আমাদিগের রক্ষার একমাত্র উপায়। লোকে অধিব
স্ত্রীসংসর্গের ক্ষমতা উত্তেজিত করিবার জন্য, ড্যামিয়ানা, ষ্ট্রীক্‌নিন্‌, কোকেন, ফস্‌ফরস্‌
গাঁজা, সিদ্ধি প্রভৃতি ব্যবহার করিতে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু ইহ
তাঁহাদের বোধ নাই যে, এরূপ করিয়া তাঁহারা মৃত্যুমুখে যাইবার পথ শীঘ্র শীঘ্র
পরিষ্কার করিতেছেন। যাঁহারা ড্যামিয়ানা জাতীয় ঔষধের প্রত্যাশীমাত্র, এ প্রবন্ধ
পাঠে তাঁহাদের উপকার হইবে না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াছেন
ও অধিক স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহা পাঠে প্রভূত উপকার লা
করিতে পারিবেন।

অস্বাভাবিক স্ত্রীসংসর্গ-প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য লজ্জাবতী পুষ্পের সিরাপ, হরী
তকীর সিরাপ, লুপুলিন্‌, নানাপ্রকার ব্রোমাইড, মনোব্রোমেট্‌ অভ ক্যাম্ফারা ইত্যা
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কত শত পণ্ডিত, কত শত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের এক্সপেরিমেণ্ট
করিতেছেন। কিন্তু বোধ হয় কেহই লক্ষ্য করেন নাই যে, সিমেন্‌ অপব্যয় সম্ব
মনোযোগ করা উচিত। অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিলে, স্পার্মিন্‌ নিজ নিজ শরীরে
থাকিয়া যায়। শরীরের প্রকৃত উপকারে আইসে ও অনেক রোগের প্রতিবন্ধক হয়
এ বিষয়ে ডাক্তার ব্রাউন সেফার্ড স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। দেশের বিজ্ঞানবি
পণ্ডিতগণের ও আমাদিগের ইহা একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ, এখনও সাধা
রণকে বুঝাইয়া না দিলে, আমাদের দেশ, একেবারে উৎসন্ন যাইবে। উষ্ণপ্রধা
দেশের লোকের স্ত্রীসংসর্গ প্রবৃত্তি, শীতপ্রধান ও মধ্যদেশ অপেক্ষা অনেক প্রবল
উষ্ণপ্রধান দেশের লোক অধিক স্ত্রীসংসর্গে রত বলিয়া তাহাদের পরমায়ুঃ অল্প।

ইহা পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে যে, যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়কারী রোগে স্ত্রীসংসর্গ প্রবৃ
অত্যন্ত প্রবল হয়। যাহাদের ব্রেণের প্রবল ইন্‌হিবিটার ক্ষমতা আছে, তাহারা
স্পাইনালকর্ডের লম্বার রিজনে সেক্‌সুয়াল সেণ্টারকে দমন রাখিতে পারে। যাহাদে
মনোবৃত্তি সকল অক্ষুণ্ণাবস্থায় থাকে, তাহাদের অপেক্ষা পাগলের বা আজন্ম ইডিয়টে
অধিক স্ত্রী সঙ্গমেচ্ছা প্রবলতর। ইহা সম্ভব যে, কোনও ব্যক্তির হয় ত মনোবৃ
বেশ অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূ
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নিম্ফোম্যানিয়া (স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ
স্যাটারায়েসিস্‌ (পুরুষের কামোন্মাদ) নামক যে ব্যাধি আছে, তাহা মরা
ম্যানিয়ার একটী বিভাগ মাত্র। যাহারা নৈতিক দুর্ব্বলতা রোগে রুগ্ন, অপ
প্রতিকারার্থী, বন্ধুবান্ধবের সৎপরামর্শ লইতে ইচ্ছুক ও আপনাদের রোগবাধক শ

ক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে নৈতিক উপদেশ দ্বারা ও কামনাশক ঔষধ দ্বারা
চিকিৎসা করিয়া তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ করা একান্ত উচিত।

ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম ডি।

মধুমেহ।

(Diabetes millctus.)

বর্ত্তমান সংখ্যা (নূতন আকারে ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা) চিকিৎসা-সম্মিলনীতে মধুমেহ
ন্ধে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমিও এ বিষয়ে দুই চারিটী
কথা লিখিতে সাহসী হইলাম। পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব। দুর্ভাগ্য বশতঃ
"মধুমেহ" ন্যূনাধিকরূপে আজ কাল বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বলিলেই হয়, ভারতের
অন্যতর প্রদেশেও বিরল নহে। এতদবস্থায় চিকিৎসা-সম্মিলনীতে এ বিষয়ের
লোচনা নিষ্ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। নানা প্রণালী ও নানা মতাবলম্বী
কিৎসক মহোদয়গণের এ সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা আছে, তাহা প্রকাশ করিলে
শের উপকার হইবার সম্ভাবনা।

মধুমেহ মস্তিষ্ক বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া নহে, ইহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। উহা
ধানতঃ পাক যন্ত্রের পীড়া। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ উহাকে (Pancreas) যন্ত্রের
ড়া বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। (Pancreas) সাধারণ পাক যন্ত্রেরই অংশ মাত্র,
র্থাৎ পাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ ও যথাযোগ্যরূপে সম্পন্ন হইবার জন্য যে যে যন্ত্রের প্রয়োজন
হারই একটী। হেমবাবুও বলিতেছেন ;—"অধিকাংশ মধুমেহ রোগ অজীর্ণ হইতে
পন্ন হয়।" বাত (Gout এবং Rheumatism) ও অশ্মরী (Stone) যেরূপ
ক যন্ত্রের দোষে উৎপন্ন হয়, মধুমেহও সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরাতন
ণী রোগে অহিফেন সেবনে যতটুকু এবং যেরূপ উপকার হয় ইহাতেও অহিফেন
তৎসারাদি (মর্ফিয়া, কোডিন, হিরোইন,—Morphia. Codein, Heroin,)
নে ততটুকু ও তদ্রূপ উপকারই হইয়া থাকে। অহিফেন মধুমেহের ঔষধ নহে।
ও আমড়ার বীজ, যজ্ঞডুমুর ইত্যাদি উহাদের বিশেষ সঙ্কোচকগুণ হেতুই কতক

পরিমাণে উপকারী বলিয়া বোধ হয়। শুষ্ক আমলকি চূর্ণ ব্যবহার করিলেও প্রস্রাবাধিক্য ও পিপাসা কমিয়া যাইতে দেখা যায়। অহিফেন কিম্বা তৎসারাদি ঔষধ সেবনে প্রস্রাবের মাত্রা কমিয়া গেলেও উহাতে অন্যান্য উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কোষ্ঠ-বদ্ধতা। যকৃতের কার্য্যক্ষমতাও কমিয়া যায় বা বিনষ্ট হয়, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু অন্যান্য প্রকার নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়; কাহারও কাহারও পীতরোগ (Jaundice) হইতেও দেখা যায়।

নূতন (Acute) ও তরুণ বয়স্কের মধুমেহে বোধ হয় কোন চিকিৎসাই ফলদায়ক নহে, পুরাতন (Chronie) ও মধ্যম বা পরিণত বয়স্কদিগের এ রোগে অহিফেনাদি ব্যবহার না করিয়া কেবল মাত্র আহারের ব্যবস্থা করিলেই রোগের উপশম হয়, এমন কি আরোগ্যও হইয়া যায়। আমি এরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, এবং আমি স্বয়ং তাহার একটী। অহিফেন সেবন করিলেও আহারের বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমি আপন ও অপর বহুসংখ্যক রোগীর শরীরে পরীক্ষা করিয়া মধুমেহ রোগীর আহার্য্য সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যাঁহাদের গোধুম ও মাংস আহারে অভ্যাস নাই এরূপ লোক মধুমেহ রোগগ্রস্ত হইলে এ দেশীয়ের আহার্য্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিত্যাগ করিয়া আটা বা ভুসির রুটী ও মাংস আহার করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না, পক্ষান্তরে বহুকাল পশ্চিমদেশে থাকিয়া কিম্বা অন্য কোন কারণ বশতঃ যাঁহারা আটার রুটী এবং মাংস আহারে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগেরও তাহা পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। আহার সম্বন্ধে মধুমেহ রোগীর প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক যথা ;—

১। কোন্ কোন্ আহার্য্য দ্রব্য সহজে পরিপাক হইবে।

২। কোন্ কোন্ দ্রব্যে শর্করা কিম্বা শর্করাতে পরিণতশীল শ্বেত সারের ভাগ কম।

৩। কোন্ কোন্ শ্বেতসার দ্রব্য কাহার পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর।

এ জগতে এমন দুইটী শরীর ও মন দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা সকল প্রকারে ও সকল বিষয়ে এক ভাবাপন্ন ;—সাদৃশ্য থাকিতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ একত্বভাব কোথাও নাই—জমজ সন্তানদিগের মধ্যেও তাহা দেখা যায় না। কি দেহ সম্বন্ধে, কি মন সম্বন্ধে দুইটী মানুষের এক নিয়ম খাটে না। একজন যে আহার্য্য পরিপাক করিতে পারে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহা পারে না। এক জনের শরীরে যে পরিমাণ শ্বেতসার

হইতে যে পরিমাণ শর্করা উৎপন্ন হয় অপর জনের শরীরে সেই পরিমাণ হয় না। এজন্য প্রত্যেক মধুমেহ রোগীকে আপনার আহার্য্য দ্রব্য তাহার পরিমাণ, ও প্রকৃতি ও প্রকার, আপনাকেই স্থির করিয়া লইতে হয় ; তবে কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা অধিকাংশ রোগীর পক্ষে উপকারী বলিয়া বোধ হয়। এই দ্রব্যগুলি আপনাপণ শরীরে পরীক্ষা করিয়া, যাহার পক্ষে যেটী সুবিধা-জনক বোধ হয়, তাঁহাই তাহার আহার্য্য-রূপে ব্যবহার করা উচিত।

১। সকল প্রকার স্নেহ পদার্থ। যথা,—ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি।

২। যে সকল ফলে, বা ফলের বীজে ঐরূপ পদার্থ আছে। যথা,—বাদাম, পেস্তা, আখরোট, আলু বোখারার বিচির শাঁস, নারিকেল ইত্যাদি।

৩। যে সকল দ্রব্যে শ্বেতসার বা শর্করা নাই, কিম্বা অতি সামান্য পরিমাণে আছে। যথা,—দুগ্ধের ছানা, পনির (ইংরাজীতে যাহাকে Cheese বলে) দধি, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, নানা প্রকার শাকসবৃজি ও তরকারী।

তণ্ডুল অপেক্ষা গোধূমে শ্বেতসারের ভাগ কম। ময়দা অপেক্ষা আটাতে কম, ভুসির ময়দাতে নাই বলিলেই হয়। অন্নের সহিত ঘৃত বা মাখন ব্যবহার করিলে কিন্তু উহাকে "ঘি ভাত" রূপে আহার করিলে অন্নের শ্বেত-সারত্বের দোষ অনেক পরিমাণে সংশোধিত হয়। যাঁহাদের পরিপাক শক্তি নিতান্ত দুর্ব্বল নহে তাঁহাদের এইরূপে অন্নাহারে বিশেষ উপকার হয়। এমন অনেক লোক আছেন যাঁহাদের সামান্য ডাল, ভাত, তরকারি, আহার করিয়া অম্বল হয় বা উদরে বায়ু উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাঁহারা "ঘি ভাত" অনায়াসে হজম করিতে পারেন। যাঁহারা গোধুম আহারে অভ্যস্ত, তাঁহাদের ময়দার পরিবর্ত্তে আটা এবং রুটীর পরিবর্ত্তে পুরী বা লুচি আহার করা উচিত। ভূসির ময়দার পাতলা রুটী বা লুচি, আমার বিবেচনায় অতিশয় উপকারী। অহিফেন সেবী, কিম্বা সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা দোষে ক্লিষ্ট মধুমেহ রোগীর পক্ষে উহা বিশেষরূপে উপকারী।

মধুমেহ রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ সময়ে সময়ে আমার জ্ঞানগোচর হইয়াছে, যাহা আমি কোন পুস্তকে এ পর্য্যন্ত পাঠ করি নাই এবং অন্য কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়াও অবগত নহি। তাহা এই,—কোন কোন রোগীর জিহ্বাতে এক প্রকার ঈষৎ মিষ্ট আস্বাদ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। এই আস্বাদ শ্বেতসার বা শর্করা জনিত দ্রব্যাদি আহার করিবার পর অধিকতর রূপে অনুভূত হয়। বারম্বার মুখ প্রক্ষালন করিয়া কিম্বা পান মসলা, তাম্রকুটাদি সেবন করিয়াও উহা বিদূরিত হয় না। কিন্তু আহারে শ্বেতসার ও শর্করা পরিত্যাগ করিলে তাহা বিদূরিত

হয়। সকল ব্যক্তিরই এক প্রকার দ্রব্য আহার করিয়া এইরূপ হয় না, কাহারও একটী কাহারও বা অন্য দ্রব্য আহারে হইয়া থাকে। আমি একটী লোকের বিষয় জানি যিনি শর্করা বা তন্নির্ম্মিত কোন দ্রব্য আহার করিলে সর্ব্বদাই ঐ দ্রব্যের আস্বাদ জিহ্বাতে লাগিয়া আছে এরূপ অনুভব করিতেন। কিন্তু সকল প্রকার শ্বেতসার পদার্থ আহারে সেরূপ অনুভব করিতেন না। অন্নাহারের পর এ আস্বাদ কখন কখন অতি সামান্য মতে অনুভব করিতেন। কিন্তু গমের ময়দা এবং আলুতে নিশ্চিতরূপে এবং বিশেষরূপে অনুভব করিতেন। শর্করা, ময়দা এবং আলু তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসহ্য ছিল। এই সময়ে তাঁহার মূত্র পরীক্ষা করিলে তাহার Specific gravity বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা যাইত। কোন শ্বেতসার বা শর্করা যুক্ত দ্রব্য যথাযোগ্যরূপে পরিপাক না হইলে, শোণিতে মূত্রে ও শরীরস্থ অন্যান্য রসাদিতে শর্করার প্রবেশ হেতু, কিম্বা শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি হওয়া বশতঃ বোধ হয় এই লক্ষণটী উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন মধুমেহ রোগীর নিশ্বাস, মর্ম্ম এবং মূত্র হইতে এক প্রকার মিষ্ট গন্ধ উদ্ভূত হয়। ইহাকে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এসিটোনের (Acetone) গন্ধ বলেন। ইহাও, বোধ হয় পূর্ব্বোল্লিখিত কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরিপাক শক্তির আবশ্যকতানুযায়ী প্রাবল্য ও বিশুদ্ধতা এবং তদ্বিপরীতাবস্থা হইতেই সম্ভবতঃ কাহারও কোন দ্রব্য আহারের পর এই লক্ষণটী প্রকাশ হয় কাহারও বা হয় না। এই লক্ষণটী উপস্থিত থাকিলে পথ্যাপথ্যের বিচার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হয়। ইহার উপরে নির্ভর করিয়া অনেক সময়ে মধুমেহ রোগীর পক্ষে কোন কোন দ্রব্য পরিত্যাজ্য তাহা অব্যর্থরূপে স্থির করিতে পারা যায়। আমি ইহা বারম্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যে দ্রব্য আহারের পর এই লক্ষণটী বিশেষরূপে প্রকাশমান হয় তাহা নিঃসন্দেহরূপে পরিত্যাজ্য।

মধুমেহ রোগে নারিকেল ব্যবহারে আমি বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। অবিশ্রান্ত পিপাসা বা মুখের শুষ্কতা, ঘন ঘন এবং অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব, মূত্রের Specific gravity ১০৪০—৪৪, এইরূপ অবস্থায় পিপাসার জন্য নারিকেলের জল বা তৎশস্য-নিষ্পীড়িত দুগ্ধ বা উভয় মিশ্রিত এবং আহারের জন্য নারিকেল শস্য ব্যবহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অবস্থার উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। অধিক মাত্রায় তাজা নারিকেল ব্যবহারে কাহারও কাহারও উদরাধ্মান, উদরে ভারবোধ, উদ্গার, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি বোধ হইয়া থাকে। এরূপ হইলে নারিকেলকে রন্ধন করিয়া নানাপ্রকার তরকারিরূপে অন্ন বা রুটির সহিত আহার করা যাইতে পারে। পিপাসা, মূত্রাধিক্য ইত্যাদি রোগের তীব্র লক্ষণগুলি কমিয়া আসিলে নারিকেল

শস্যকে রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করা উচিত। আমি যে প্রদেশে থাকিয়া মধুমেহে নারিকেলের উপকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, সে প্রদেশে নারিকেল উৎপন্ন হয় না, সচরাচর বাজারে প্রাপ্য "ঝুনো" নারিকেলই আমি ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস "ডাব" অপেক্ষা "ঝুনো" এবং তাজা ঝুনো নারিকেল অপেক্ষা রৌদ্রতাপে শুষ্ক অর্থাৎ যাহাতে নারিকেলের জলীয়াংশ নাই কিম্বা অতি অল্প মাত্রায় আছে এবং তিলিকাংশ অধিক, তাহাই পুরাতন মধুমেহে ফলদায়ক।

আমার সামান্য অভিজ্ঞতানুসারে মধুমেহ রোগীর পক্ষে সাধারণতঃ কোন কোন খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার্য্য এবং কোন কোন দ্রব্য পরিত্যাজ্য নিয়ে তাহার একটী তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।

ব্যবহার্য্য।

মাংস। কিন্তু যকৃৎ বা "মেটলী" পরিত্যাজ্য।

মৎস্য। ডিম্ব।

দুগ্ধ এবং তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি যথা ;—দধি, ছানা, পণির ঘৃত, মাখন, মালাই।

তণ্ডুল। ঐ দুগ্ধ, দধি, মাখন, ঘৃত এবং শ্বেতসার ও শর্করাবিহীন দ্রব্যের ব্যঞ্জনাদির সহিত।

আটা কিম্বা ভুসির ময়দা বা উভয় মিশ্রিত (পরিপাক শক্তির অনুযায়ী)।

ডাল। সকলপ্রকার (ছোলার ডাল কাহারও কাহারও পক্ষে অনিষ্টকর)।

শ্বেতসার ও শর্করাহীন তরকারী যথা ;—পটল, সিম ও বরবটি (বীজ পরিত্যাজ্য) লাউ, কুমড়ো (মিঠে বা "বিলাতী কুমড়ো" পরিত্যাজ্য) কাঁকড়, শশা, খীরা ও কাঁকরোল (শেষোক্ত দুইটী পূর্ব্ববাঙ্গালায় প্রাপ্তব্য) বেগুণ, মূলো, ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, কাঁচা পেঁপে, কাঁচকলা (কাহারও কাহারও পক্ষে অনিষ্টকর), মোচা, থোড়, সজিনা, (ফুল ও কচি পাতা) ডুমুর, কপি Cabbage জাতীয়, ফুলকপি অনিষ্টকর), সানগম। নানাপ্রকারের শাক, যথা ;—লাউ, কুমড়ো, মূলো, সরিষা, লাল আলুর শাক (আলু পরিত্যাজ্য), পালম, বেথুয়া, মেথী, পুনর্নবা, কচু, কল্মি, নটে, ডেঙ্গো (ডাঁটা পরিত্যাজ্য), পুঁই। পলতা, হেলেঞ্চা, গিমা। ওল এবং সকল প্রকার কচু। কাঁটালের বিচি, শাঁক আলু, বিলাতী বেগুণ (Tomatre) এই তিনটী কাহারও কাহারও পক্ষে অনিষ্টকর। গোল আলু সম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। কেহ কেহ বলেন উহা জলে সিদ্ধ না করিয়া, খোসা সহ অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া

লইলে ব্যবহার করা যায়। আমার বিবেচনায় আলু জাতীয় সমুদায় দ্রব্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

মিষ্টতা হেতু প্রায় সকল ফলই পরিত্যাজ্য।—আপেল, মেওসন্তারা ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাদাম, পেস্তা, আখরোট, চালগোজা ও নারিকেল নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার্য্য। চা, কাফি, ব্যবহার্য্য। কোকোয়া সম্বন্ধে মতান্তর আছে। আমার বিবেচনায় তাহাও ব্যবহার্য্য। সুস্বাদ করিবার জন্য এই সকল দ্রব্যাদির সহিত চিনির পরিবর্ত্তে স্যাকেরিণ বা স্যাকসিন (Saccharine or Saxin) ব্যবহার করিবেন।

পরিত্যজ্য। সকল প্রকার মিষ্টদ্রব্য, চিনি, মিষ্টান্ন ও মিষ্ট ফলাদি। ময়দা,—পাঁউরুটি, বিস্কুটাদি (Bran food ও Bran pulse Ciups এবং almond ও Cocoanuts fuisinut যাহা আজ কাল প্রস্তুত হইতেছে, ব্যবহার করা যাইতে পারে)। আলু, মটর, ছোলা, কড়াইশুঁটী, বিট, গাজর, ফুলকপি পেয়াজ, দুগ্ধের ক্ষীর, শুষ্ক ফল, যথা ;—কিস্‌মিস্ মনক্কা, অঞ্জির, বেদানা। সাগু, বার্লি, আরারুট, টেপিওকা। কাঁকড়া গুগলী।

পানীয় দ্রব্যাদীর মধ্যে লেমনেড, জিঞ্জারেড (Lemonade Gingerade) ও সরবত বা Syrup ইত্যাদি সমুদায় মিষ্ট দ্রব্য পরিত্যজ্য। সকল প্রকারের মদ্য পরিত্যজ্য। সাধারণতঃ অম্ল দ্রব্যাদিও ব্যবহার না করিলে ভাল হয়।

মধুমেহ রোগীর পক্ষে শারিরীক ব্যায়াম বিশেষরূপে ফল দায়ক। শরীরের শক্তি অনুসারে প্রতি দিন নিয়মিতরূপে ন্যুনাধিক ৪।৫ মাইল পাদচারণ কিম্বা ডন ফেলা, বা মুগুর ভাঁজা, কিম্বা স্যাণ্ডোর Grip Dumb-bell ব্যবহার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কুস্তি ফুটবল, ক্রিকেট (Cricket), নানাপ্রকারের প্রচলিত Gymnastic (Horizontal bar, parallel bar, Trapeze ইত্যাদির সাহায্যে,) পরিত্যজ্য। ব্যায়ামের পর শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া (কেহ কেহ ব্যায়ামের পূর্ব্বে তৈল মর্দ্দন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন) ঈষদুষ্ণ বা শীতল জলে স্নান করা বা সিক্ত বস্ত্রে শরীর মুঁছিয়া ফেলা আবশ্যক। মধুমেহ রোগীর পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন। সঞ্চিত ময়লা পরিস্কৃত করিবার জন্য মাত্র সময়ে সময়ে সাবান ব্যবহার করা উচিত। তিল, নারিকেল, ফুলেল এবং বাদাম তৈল ব্যবহার্য্য। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়াই ব্যায়াম করা উচিত। অপরাহ্নে, সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে ব্যায়াম ফলদায়ক নহে, কাহারও কাহারও পক্ষে অনিষ্টকর।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত।
সিঃ সার্জ্জন। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশ।

"নাড়ীজ্ঞান-লাভোপায়।

তরঙ্গিত রক্তবেগ যে ধমনী (Artery) দ্বারা রক্তাধার হৃৎপিণ্ড (heart) হইতে দেহের সমগ্র স্থানে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে নাড়ী (Pulse) বলে। সাধারণতঃ মণিবন্ধে (Wrist) নাড়ী পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু গণ্ডস্থল (cheek) উরু (Thigh) পদ (Leg) কণ্ঠ (Throat) বা শরীরের অন্য যে কোন স্থানে ধমনী দৃষ্ট হয় ; সেইস্থান স্পর্শে নাড়ী স্পন্দন অনুভূত হয়। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন সময় বা অনতি বিলম্বেই রেডিয়েল ধমনীতে (Radial Artery) ধাক্কা উৎপন্ন হয় এবং পদের ধমনী সকলে বিলম্বে ধাক্কা উৎপাদন করে। নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের, রক্তগতি, ও অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়।

হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। তাহার কারণ এই যে, উক্ত প্রকার ক্রিয়া দ্বারা ধমনীর টান কমিয়া যাওয়ায় নাড়ী স্পন্দন উত্তমরূপে হৃদয়গত হয়।

হৃদ্‌পিণ্ডের সবল স্পন্দনে নাড়ী মোটা ও পূর্ণ (Large and full) বোধ হয় ; এবং হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে নাড়ীও ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল (small and weak) বোধ হয়। (ক) হৃদ্‌পিণ্ডের বিসর্জ্জন বা প্রদাহ হেতু দ্রুত নাড়ীকে দ্রুত নাড়ী (quick and strong pulse) বলে। (খ) দুর্ব্বল ব্যাধিবশতঃ ও হৃদ্‌পিণ্ডের প্রসারণে স্বাভাবিক অপেক্ষা মন্দ গতি নাড়ীকে মন্দ বা দুর্ব্বল নাড়ী (slow or weak pulse) বলে। (গ) অনিয়মিত সঞ্চালিত নাড়ীকে (irregular pulse) বলে। (ঘ) অন্ত্রীয় রোগে নাড়ী অনুভব না হইলে তাহাকে লুপ্তনাড়ী (Falling pulse) বলে। (ঙ) স্নায়ু মণ্ডলের বিকাররোগে ও হৃদ্‌পিণ্ডের যান্ত্রিক পীড়াতে নাড়ী অসমান কি পরিবর্ত্তনশালী হইলে তাহাকে Intermittent pulse অর্থাৎ ক্ষয়নাড়ী বলা যায়।

বয়ঃ ভেদে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম বশতঃ নাড়ী স্পন্দনের তারতম্য হয় ; যথা—বৃদ্ধাবস্থায় ধমনী কঠিন হয় ও তাহার স্থিতিস্থাপক গুণাল্পতা হেতু হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে না হওয়ায় নাড়ীর বেগ কঠিন, দুর্ব্বল, তীক্ষ্ণভাবে (hard weak and sharp) পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে স্পন্দন-তারতম্য বিজ্ঞাপনটী উদ্ধৃত হইল। যথা—

পুরুষ।

বয়স	১ মিনিট		বার
শিশুর জন্ম হইতে দন্তোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত	„	…	১০০—১২০
দন্তোৎপত্তির পর হইতে ৬।৭ বর্ষ পর্য্যন্ত	„	…	৮৫—৯৫
৬।৭ বর্ষ হইতে ১৪।১৫ বর্ষ পর্য্যন্ত	„	…	৮০—৮৫
যুবক	„	…	৭০—৭৫
প্রৌঢ়	„	…	৬৫—৭০
বৃদ্ধ	„	…	৫৫—৬০

স্ত্রী।

বয়স	১ মিনিট		বার
বালিকার জন্ম হইতে দন্তোৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত	„	…	১০০—১২০
দন্তোৎপত্তির পর হইতে ৬।৭ বর্ষ পর্য্যন্ত	„	…	৮৫—৯৫
৬।৭ বর্ষ হইতে ১৪।১৫ বর্ষ পর্য্যন্ত	„	…	৮০—৮৫
যুবতী	„	…	৭৬—৮৪
প্রৌঢ়া	„	…	৭০—৭৫
বৃদ্ধা	„	…	৬৫—৭০

কেবল যে বয়সানুসারে নাড়ী স্পন্দনের ইতর বিশেষ হয় এমন নহে। ইহা অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, প্রকৃতি (Nature), অবস্থা (state), পেশীর সঞ্চালনানুসারেও নাড়ীর বেগের পার্থক্য হয়। যথা—শীতল বারি সংস্পর্শে কৈশিকানাড়ীর রক্ত অন্যান্য স্থানে গমন করায় নাড়ী সূক্ষ্ম ও কঠিন হয় এবং উষ্ণজলাবগাহনে শোণিত কৈশিকা নাড়ীতে প্রবিষ্ট হওয়ায় ধমনীর বল কমিয়া যায়, তদ্ধেতু নাড়ী পূর্ণ ও কোমল হয়। এজন্য শয়ন, ভোজন বা ভোজনাবশেষেই অবগাহন বা অবগাহন পরেই, ভ্রমণ বা ভ্রমণ পরেই, উপবেশন, দাঁড়ান, শারীরিক মানসিক শ্রম এই সকল সময় নাড়ীর বেগের ভিন্নতা লক্ষিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন যে, উক্ত সময় সকল নাড়ী নিরূপণ করা যায় না। প্রমাণ যথা—

"সদ্যঃস্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশীলিনঃ।
ব্যায়ামক্লান্তদেহস্য সম্যক্ নাড়ী ন বুদ্ধ্যতে॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনের সহিত হৃৎপিণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় সুখ, দুঃখ, চিন্তা, ভয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে মন চঞ্চল হইলে নাড়ীও চাঞ্চল্য ভাব ধারণ করে, সন্দেহ নাই

"চিন্তা জ্বরঃ মনুষাণাং"

অর্থাৎ চিন্তাতেই চিন্তিত ব্যক্তি জ্বরাক্রান্ত। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, নাড়ী স্পন্দন দ্বারা রোগারোগ নির্ণীত হওয়া একবারে অসম্ভব। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে যুবক দেয় প্রতি মিনিটে ৭০—৭৫ বার, প্রৌঢ়ের ৬৫—৭০ বার নাড়ী স্পন্দন হয় ইত্যাদি। কিন্তু স্বভাব ও বয়সানুসারে যুবকের ৭৫—৮০ বার হওয়া অসম্ভব নয়। এবং তাহাই যদি অসম্ভব হয় তবে উক্ত ৭০—৭৫ বারের মধ্যে কাহার কতবার নাড়ী স্পন্দন হয় এই বিষয় জানিবার উপায় কি? স্বভাববিৎ এবং অবস্থাজ্ঞ (শারীরিক মানসিক অবস্থাজ্ঞ) ব্যক্তি ধরাধামে কোথা? কোন্ চিকিৎসক এ পরের মনের কথা জানা, পর শরীরে প্রবেশ ইত্যাদি এমন বিভূতি লাভ করায় বিভূতি ভূষণ হইয়াছেন? অতএব নাড়ী স্পন্দন দ্বারা নাড়ী জ্ঞানলাভ করা ও রোগ নির্জীত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।—

যদি বলেন "আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রে" নাড়ী বিজ্ঞান এমন বিস্তৃত এবং বিশদ যে, নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় কার হয়।

শ্রীবসন্তকুমার প্রামাণিক।
সাং তাড়দা, পোঃ আঃ ভাঙ্গড়, জেলা—২৪ পরগণা।

শরীরোৎপত্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় এবং পাশ্চাত্যমতের তুলনা—

শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার সার মর্ম্ম এই, লিঙ্গদেহাধিষ্ঠিত আত্মা, পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগার্থ শুক্রযোগে স্ত্রী গর্ভে প্রবেশ করে, জীবাত্মাবস্থিত শুক্রশোণিত, পঞ্চভূত দ্বারা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, যখন অঙ্গোপাঙ্গ সংযুক্ত হয়, তখন ইহার "শরীর" এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ভোগকার্য্য, ভোক্তৃভোগ্যের সম্বন্ধব্যতীত নিষ্পন্ন হইতে পারে না। কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তৃ-করণ-কর্ম্ম, এই তিনের পরস্পর সংযোগে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়), ইহাদের সাধারণ নাম করণ, কর্ত্তা ইহদিগে দ্বারা ভোগ্যবস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া, সঞ্চিত কর্ম্মফল উপভোগ করেন। আত্মার সহিত অর্থ বা বিষয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না; অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রয়ের সহিত মন এবং মনের সহিত আত্মা* এইরূপে পূর্ব্বটীর পরবর্ত্তীর সহিত পরস্পর সম্বন্ধ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও পুরুষ সকল প্রকার বীজ সৃষ্টির মূল কারণ। ব্যাপক দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র পদার্থ নহেন; প্রকৃতি পরমাত্মারই গুণ বা শক্তি, শক্তি ও শক্তিমান্ স্বরূপতঃ ভিন্ন নন্। পরমাত্মার দুই অবস্থা—দ্বিবিধ ভাব, একটী সন্মাত্রাবস্থা কারণাত্মভাব, অপরটী কার্য্যাত্মভাব; দুই প্রকার ভাবই নিত্য। তবে একটী ধ্রুব, কূটস্থনিত্য, অন্যটী প্রবাহ-রূপে নিত্য। উৎপত্তি বিনাশশীল জগৎ তাঁহার কার্য্যাবস্থা। প্রকৃতি, কার্য্যাবস্থাতেই পুরুষ বা শক্তিমান্ হইতে পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। একাকী কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, কেবল ভোক্তৃ শক্তি হইতে ভোগ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব, কর্ম্মের রূপ ভাবিতে গেলে, কর্ত্তৃ কর্ম্ম করণের মিলিত মূর্ত্তি হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবেই। সংযোগ ব্যতীত যখন কোন কার্য্য হয় না এবং একটী ভাব হইতে যখন সংযোগ হইতে পারে না, তখন ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর ভিন্ন পদার্থই ভাবিতে হইবে।

---

* "নৈকঃ প্রবর্ত্ততে কর্ত্তুং ভূতাত্মা নাশ্নুতে ফলম্
সংযোগাদ্বর্ত্ততে সর্ব্বং তমৃতে নাস্তি কিঞ্চন।
নহ্যেকো বর্ত্ততে ভাবো বর্ত্ততে নাপ্য হেতুকঃ॥" চরক-সংহিতা।

রজঃ ও তমঃ দুই পার্শ্বে, মধ্যে সত্ত্ব, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এইরূপ। রজঃ ও তমঃ বা পুং শক্তি ও স্ত্রী শক্তির—অন্যোন্যাভিভব-ভাব হইতে সত্ত্বের উপরি যে নানাবিধ ভাবতরঙ্গ, উত্থিত হইয়া, ক্রীড়া করে, সেই অনন্ত ভাব তরঙ্গের সমষ্টিই জাগতিক অনুভূতি। বুঝিতে পারা গেল, কেবল সত্ত্ব—নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ইনি কর্ম্ম কর্ত্তা বা আবির্ভাবাদি বিকারাত্মক নহেন। রজঃ ও তমঃ দ্বারা চতুর্ব্বিংশ কর্ম্ম পুরুষের উদ্ভব হয়; কর্ম্মফল, জ্ঞান, মোহ, সুখ, দুঃখ জীবন এবং মরণ, এই পুরুষেই প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্ম বৈচিত্র্য বশতঃ ইহাঁর অনন্ত ভেদ। বীণা ও নখের সংঘর্ষে উৎপন্ন এক শব্দ যেমন রজঃ ও তমো গুণের ক্রিয়া ভেদে নানাভাব ধারণ করে, এক সত্ত্বও সেই প্রকার রজঃ ও তমো গুণের ক্রিয়া ভেদে অনন্তভাবে পরিণত ও উপলব্ধ হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মাধর্ম্ম বা শুভাশুভ কর্ম্মই উচ্চাবচ সৃষ্টির কারণ—সৃষ্টি বৈচিত্র্যের হেতু। বুঝিয়াছি জগৎ অনাদি, সুতরাং কর্ম্মের আদি কি? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না।*

শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য নর শরীর বিধান হইতে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে, কোমল অণ্ডলাল নির্ম্মিত (Albuminous) এক প্রকার আদি পদার্থ আছে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, সকল প্রকার প্রাণি শরীরের ইহাই উপাদান কারণ। এই শরীর বীজভূত পদার্থটী শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে উক্ত হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট প্রাণিদিগের দেহে ইহা স্যার্কোড্ (Sarcode), উদ্ভিদ দেহে প্রোটোপ্ল্যাজম্ (Protoplasm) ও উৎকৃষ্ট প্রাণি দেহে ব্লাস্‌টেমা (Blastema), এবং শরীরোৎপত্তি ও পুষ্টির ইহাই একমাত্র কারণ, এবম্প্রকার বিশ্বাসবশতঃ জার্ম্মিন্যাল ম্যাটর (Germinal matter) নামেও ইহা অভিহিত হইয়া থাকে।† পাশ্চাত্য

---

* "করণানিমনোবুদ্ধি বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ত্তুঃ সংযোগজং কর্ম্মবেদনা বুদ্ধিরেবব॥
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনোর্থানাং বিদ্যাদ্যোগধরং পরং।
চতুর্ব্বিংশক ইত্যেষরাশি পুরুষ সংজ্ঞকঃ॥
রজস্তমোভ্যাং যুক্তস্ত সংযোগোহয়মনন্তবান্।
তাভ্যাং নিরাকৃতাভ্যাস্তু সত্ত্ববুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে॥
অত্র কর্ম্মফলঞ্চাত্র জ্ঞানং চাত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
অত্র মোহঃ সুখং দুঃখং জীবিতং মরণংস্ততা॥"—চরক-সংহিতা।

আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, এই সকল শ্লোকই তাহার আশ্রয়।

† "This albuminous substance has received various names according to the structures in which it has been found. * * * In the bodies of the lowest animals, as the

সিদ্ধান্ত, সজীব আদি পদার্থের (Liviney Albuminous matter or protoplasm) যত অধিক সংখ্যা পরস্পর মিলিত হয়, তত উৎকৃষ্ট জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য নর শরীর বিধান শাস্ত্র নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, শরীরোৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাই যে অভ্রান্ত বা চরম সিদ্ধান্ত, তাহা বলিতে পারা যায় না।* বস্তুতঃ তাহাই বটে। শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। অসংখ্য সজীব কোষ পদার্থ জগতে ভাসিতেছে, তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণি শরীর নির্ম্মাণ করে। এইরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা, ইহারা কি উদ্দেশ্যে, কাহার প্রেরণায় পরস্পর মিলিত হয় এবং কি জন্যই বা পরস্পর মিলিত হইয়া, আবার অবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ইত্যাদি অবশ্যপরিজ্ঞেয় বিষয়গুলির এ সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনরূপ মীমাংসা হইতে পারে না। আমরা স্থানান্তরে ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব, আপাততঃ প্রতিজ্ঞাচ্ছলে বলিয়া রাখিতেছি, এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই সত্য। ইহা হইতে এ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আর কিছু হইতে পারে না।

শরীর যন্ত্র ও তৎকার্য্য।—যদ্দারা ক্রিয়া নিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে কারক বলে, সুতরাং, কোন কার্য্য বা মূর্ত্ত ক্রিয়ার স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তৎকারকের তত্ত্বানুসন্ধান করাই একমাত্র কার্য্য।

"স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।"—পা ১।৪।৫৪।

"ক্রিয়া প্রসিদ্ধৌ স্বাতন্ত্রোণ বিবক্ষ্যতে তৎকারকং কর্তৃসংজ্ঞং ভবতি।"—কাশিকা।

অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পত্তিতে যে কারককে স্বতন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তৎকারকের নাম কর্ত্তা। যে কারকের যাহা আদ্যোৎপত্তি স্থান—যাহা হইতে যে কার্য্য প্রথম আরব্ধ হয়, তাহাকে তাৎকার্য্যের স্বতন্ত্র বা প্রধান ভূত কারণ বলা যায়, ইহারই নাম কর্ত্তা। কর্তৃকারক ভিন্ন কারকাদির ক্রিয়া নিষ্পাদকত্ব থাকিলেও, প্রধান

Rhizopoda or Gregarinida, of which it forms the greater portion, it has been called 'sarcode', * * * when discovered in vegetable cells, and supposed to be the prime agent in their construction, it was termed protoplasm. As the presumed formative matter in animal tissues it was called 'blastema'; and with the belief that wherever found, it alone of all matters has to do with generation and nutrition, Dr. Beale has surnamed it 'Germinal matter'."—KIRKES' PHYSIOLOGY. p. 19—20.

* "We must not forget that its relations to the parts with which it is incorporated are still very doubtfully known; and all theories concerning it must be considered only tentative and of uncertain stability."—KIRKES' PHYSIOLOGY. p. 22.

কর্ত্তার আদেশ না পাইলে, তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া তাহারা স্বতন্ত্র নহে।

যে কোনরূপ ক্রিয়া হউক, তাহা চৈতন্যাধিষ্ঠিতে শক্তি দ্বারা সাধিত হয়—চৈতন্যের নোদন কর্ম্মোৎপত্তির আদি কারণ। আত্মা বুদ্ধি দ্বারা অর্থোপলব্ধি করিয়া, মনকে তৎকর্ম্ম সাধনের ভার অর্পণ করেন, মন আবার অধস্তন কর্ম্মচারিদিগের স্কন্দে যোগ্যতানুসারে কর্ম্মভার বণ্টন করিয়া দেয়।

প্রধান কর্ত্তার* সহিত অন্যান্য নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ হয় না, তিনি একটী গুপ্ত স্থানে অবস্থান করেন। শিরঃ বা মস্তিষ্কই প্রধান কর্ত্তার আবাস গৃহ।†

---

† প্রধানকর্ত্তা বলিবার তাৎপর্য্য হইতেছে, অন্যান্য কারক সমূহ, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না। অগ্নি আছে, জল আছে, তণ্ডুল আছে, কাষ্ঠ আছে, কিন্তু ইহারা স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কখন অন্নপাক কার্য্য নিষ্পাদন করে না, পাচক পুরুষের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে ইহারা শক্তি সত্ত্বেও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। ভগবান পাতঞ্জলিদেবের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য—

"কথং পুনর্জ্জায়তে কর্ত্তা প্রধানমিতি? যৎ সর্ব্বেষু সাধনেষু সংনিহিতেষু কর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতা ভবতি।"

মহাভাষ্য।

* অনেকের বিশ্বাস, মস্তিষ্ক যে চৈতন্যের প্রধান স্থান, এদেশে সে তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই, কথাটা বস্তুতঃ অমূলক। শিরঃ এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থই বলিয়া দিতেছে যে, সকল শারীর যন্ত্রই শিরকে আশ্রয় করিয়া, বিদ্যমান আছে, শিরই চৈতন্যের প্রধান আবাস স্থান—প্রধান কর্ত্তার নিকেতন। "শ্রয়তে স্বাঙ্গে শিরঃ কিচ্চ।"—উণাদি সূত্র।

অর্থাৎ 'শ্রি' ধাতুর উত্তর 'অসুন' প্রত্যয় করিয়া, শিরঃ পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। শ্রি ধাতুর অর্থ আশ্রয় করা, সেবা করা। চক্ষুঃ, কর্ণ, মন, বাক্ আদি ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে শিরঃ বলে। ঐতরেয় আরণ্যকে ঠিক এই কথাই বুঝান হইয়াছে, যথা—

"উদ্ধং ত্বেবোদসর্পত্তচ্ছিরোঽশ্রয়ত যচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবত্তচ্ছিরসঃ, শিরস্তং, তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ শ্রয়ন্তেঽস্মিঞ্ছ্রিয়ঃ য এবমেতচ্ছিরসঃ শিরস্তং বেদঃ। ২ আ। ১ অ। ৫ খণ্ড।

আত্মাকর্ত্তৃক আশ্রিত—বিশেষরূপে অধিষ্ঠিত এবং শ্রোত্র, মনঃ, বাক্, প্রাণ ইত্যাদি করণ সকলও ইহাকেই প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে, তাই শিরের 'শিরঃ' এই নাম হইয়াছে।

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং যত্র শ্রিতাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
যদুত্তমাঙ্গমঙ্গানাং শিরস্তদভিধীয়তে॥"

চরক সংহিতা।

অর্থাৎ প্রাণিদিগের প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে অঙ্গের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাকে শিরঃ বলে।

ক্রিয়া হইলেই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী—ক্রিয়া হইলেই ক্ষয় হইয়া থাকে। আবির্ভাবের পর তিরোভাব হইবেই।* শরীর সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল, ক্ষণকালের নিমিত্তও কোন যন্ত্র নিষ্ক্রিয় নহে, সুতরাং সর্ব্বদাই যে শরীরে ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। শরীর যখন অবিরামই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমরা জীবিত থাকি কিরূপে? অগ্নি সংরক্ষণ করিতে হইলে, তাহাতে যেমন কাষ্ঠ বা অঙ্গারাদি দাহ্য বস্তু সংযোগ করিতে হয়, কায়াগ্নি বা তনূনপাৎকে রক্ষা করিতে হইলেও, সেই প্রকার প্রয়োজনানুসারে অন্ন যোগাইতে হইয়া থাকে। কায়াগ্নি নিরন্তর শরীরকে পাক করিতেছে বটে, সর্ব্বদা শরীরের সর্ব্বত্রই সন্দাহন ক্রিয়া চলিতেছে সত্য, কিন্তু আহার দ্বারা আমরা শরীরের ক্ষতিপূরণ করিতে পারি বলিয়া জীবিত থাকি।†

ক্রমশঃ—

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে—একাল ও সেকাল।

মানব যতই অধঃপতিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও পরমুখাপেক্ষ হউক না কেন, যতদিন জীবিকায় আঘাত না পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে আত্মনির্ভরতা বা আত্মোন্নতি সাধনের চিন্তা জাগ্রত হয় না। অন্নবস্ত্রের ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়াই, আজিকালি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিলুপ্তপ্রায় শিল্প বাণিজ্য ও বিবিধ দেশহিতকর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনাদিগের দুঃখাপনোদনে মনঃসংযোগ করিতে দেখা যাইতেছে, পরাধীন জাতির পক্ষে যতটুকু সম্ভব, তাহার চেষ্টারও সূত্রপাত হইতেছে। কিঞ্চিৎ সুবাতাস বহিয়াছে, উপযুক্ত আদর্শও মিলিয়াছে। এখন ফলাফল অদৃষ্টাপেক্ষ।

কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে স্বাস্থ্য বা আরোগ্য। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভিন্ন ব্যক্তিগত উন্নতিই অসম্ভব,—জাতীয় উন্নতি ত দূরের কথা।

---

‡ "যাবদনেন বর্ত্তিতব্যমপায়েন বা যুজ্যতে, তচ্চোভয়ং সর্ব্বত্র।"—মহাভাষ্য।

"All work, as we have seen, implies waste."

PHYSIOLOGY BY HUXLEY.

‡ "Evrywhere oxidation is going on, oxidation either of the blood itself or of the structures which it bathes, and whose losses it has to make good."

—FOSTER'S PHYSIOLOGY, p. 128.

আধুনিক বাঙ্গালিজাতি সেই স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের কথা না ধরিলেও, গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাঙ্গালিজাতির শারীরিক অবস্থার নিতান্ত শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। বলবীর্য্যশালী, সুদৃঢ়কায়, শ্রমসহিষ্ণু ও পিতামহের সহিত দুর্ব্বল, শীর্ণদেহ, অলস ও সভ্যতাভিমানী পৌত্রের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসম্পদের পরস্পর তুলনা করিলে, আমাদের কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। বিশেষতঃ বঙ্গের উচ্চতর জাতীয় ব্যক্তিগণের পরিণাম চিন্তা করিয়া, আমাদের বড়ই দুর্ভাবনা হয়। কারণ গত পঞ্চাশদ্বর্ষেই যখন তাঁহাদের মধ্যে এরূপ স্বাস্থ্যহানি, বিবিধ রোগোৎপত্তি ও অকাল মৃত্যুর এত বাহুল্য ঘটিয়াছে, তখন তদনুপাতে আর শত বর্ষ পরে তাঁহাদের যে আরও কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে এবং অনেক প্রাচীন জমীদারবংশীয়ের মধ্যে যেরূপ কুলক্ষয় আরব্ধ হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে সে সকল বংশ স্থায়িত্ব লাভ করিবে কি না, তাহা চিন্তা করিয়া, আমরা একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছি। বাঙ্গালিজাতির উপর যেন শনিগ্রহের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, আজি কালি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির বিষয়টা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা এ সময় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। আমরা গত পঞ্চাশদ্বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে "সেকাল," আর তৎপরবর্ত্তী কালকে "একাল" নামে অভিহিত করিব এবং একাল ও সেকালের লোকের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার শোচনীয় বৈসদৃশ্যের কারণানুসন্ধানে প্রয়াস পাইব।

আধুনিক বাঙ্গালিজাতির এই প্রকার নিদারুণ স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকালমৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া, সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্বদেশীয় স্বাস্থ্যবিধানের আদেশ লঙ্ঘন ও বিদেশীয় বা জাতীয়প্রকৃতির বিরোধী আহারাচারের বাহুল্যই তাহাদের উক্ত সর্ব্বনাশের মূল। আহারব্যবহারাদির পক্ষে জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী হইলে, লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গ বা অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কাহারও কোনও প্রকার সন্দেহের উদয় না হইতে পারে; কিন্তু স্বদেশীয় স্বাস্থ্যবিধান লঙ্ঘনের কথায় যদি কাহারও চিত্তে এরূপ কুতর্কের উদয় হয় যে, সেকালে কি দেশের সকল লোকেই স্বাস্থ্যবিধানে পণ্ডিত ছিল এবং সকলেই কি সর্ব্বতোভাবে সেই সকল নিয়মের প্রতিপালন করিয়া চলিতে সক্ষম হইত? তাঁহাদিগকে আমাদের বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আজিকালি ইংরাজী শিক্ষা করিয়া এবং ইংরাজীশিক্ষিত, পাশ্চাত্য-সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিগণের সংসর্গে বাস করিয়া, একালের লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল ও শাস্ত্র বা ঋষিবাক্যে যেরূপ অশ্রদ্ধা ও অভক্তি জন্মিয়াছে, সেকালের লোকের

সেরূপ ছিল না। একাদশীর উপবাস, অষ্টমী নবমী বা ত্রয়োদশীতে নারিকেল, অলাবু ও বার্ত্তাকু ভক্ষণের নিষেধ, পূর্ণিমা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য, বর্জ্জনের কঠোর অনুশাসন এবং এই জাতীয় সহস্র প্রকার খুঁটিনাটীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাইলে, এ কালের লোকেরা যেরূপ অগ্রাহ্য করে, সেকালের লোকেরা সেরূপ করিতে সাহস করিত না। কি ধর্ম্মনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি, কি স্বাস্থ্যনীতি, যে কোনও বিষয়েই হউক না কেন, সে সকলের সমালোচনা করা বা কারণানুসন্ধান করিতে যাওয়া দূরে থাকুক, তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা কিছু আদেশ করিয়া গিয়াছেন, ভগবানের আদেশতুল্য তাহা জ্ঞান করিয়া, তাহারা একান্ত ভক্তিভাবে ও অবনত মস্তকে তৎসমুদয়ের প্রতিপালনে সদাই সযত্ন থাকিত। আবার পক্ষান্তরে ঐ সকলের দৈবাৎ অপালনবশতঃ তাহারা আপনাদিগকে ঘোরতর প্রত্যবায়গ্রস্ত জ্ঞান করিয়া, নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে উহার প্রায়শ্চিত্ত সাধনে প্রয়াস পাইত। হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজ সম্বন্ধে যে সকল রীতিনীতি বা আচারব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই প্রায়শঃ এতদ্দেশীয় জনগণের শরীরের পক্ষে একান্ত অনুকূল। সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের আদিষ্ট বিধিব্যবস্থাসমূহের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অতি তুচ্ছতম বিষয়টী পর্য্যন্ত সংসারিগণের স্বাস্থ্যের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং তৎপ্রতিপালনকালে সাধারণের—জ্ঞাতসারেই হউক, অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহ রক্ষিত হইত এবং বিনা আয়াসে স্বাস্থ্যবিধানের জয়ঢাক না বাজাইয়াও, সুস্থশরীরে, প্রফুল্লচিত্তে সেকালের লোকেরা সুদীর্ঘ জীবন সম্ভোগ করিতে পারিত। শাস্ত্রাদেশের প্রতি অনাস্থাবশতঃই একালের লোকের প্রাগুক্ত উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ঘটিয়া উঠে না। তজ্জন্যই সেকালের সেই সুস্থ, সুদৃঢ়কায় বলবীর্য্যশালী ও দীর্ঘজীবী ব্যক্তিগণের পরিবর্ত্তে এক্ষণে অসুস্থ, শীর্ণদেহ, দুর্ব্বল ও অকালমরণশীল মানবশ্রেণী আবির্ভূত হইয়া, জগতে "ভীরু ও কাপুরুষ বাঙ্গালী" নাম ধারণপূর্ব্বক রত্ন ও বীরপ্রসবিনী জন্মভূমির কলঙ্ক বর্দ্ধন করিতেছে।

মানবসৃষ্টির আদি হইতে একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত জাতির অভ্যুত্থান অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে? কোনও জাতি বা সমাজ-বিশেষের পরমায়ু তাহার ভিত্তির গঠনপ্রণালীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে জাতির সমাজ ধর্ম্মনীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত এবং যে জাতির প্রত্যেক সামাজিক বন্ধন ধর্ম্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই জাতিই জগতে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়। আর যে জাতির ধর্ম্মবন্ধন নিতান্ত শিথিল এবং যাহাদের সামাজিক রীতিতে ধর্ম্ম-ভাব তাদৃশ প্রাধান্যলাভ করে নাই, সে জাতির সমাজ পৃথিবীতে কখনই দীর্ঘকাল

স্থায়ী হইতে পারে না। জগতের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অধিক কি, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, মহাবলপরাক্রান্ত সেই প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, যাহারা একদিন সভ্যতা ও বিদ্যালোক প্রজ্বলিত করিয়া, পৃথিবীর অর্দ্ধাংশকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, যাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া, য়ুরোপীয়েরা আজিও আপনাদিগের গৌরব ঘোষণা করে, ধর্ম্মনীতির প্রাধান্যের অভাবে সে সমাজদ্বয়ও এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজি কালি আমরা যে গ্রীক ও রোমকদিগকে দেখিতে পাই, তাহারা সে প্রাচীন জাতি নহে। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর গঠিত এবং তাহার প্রত্যেক বিধিব্যবস্থা ধর্ম্মনীতির কঠোর শাসনে শাসিত বলিয়া, বহু পুরাতন হইয়াও, আজি পর্য্যন্ত জীবিত আছে। এই সমাজ মধ্যে সকল নীতি অপেক্ষা ধর্ম্মনীতি অধিকতর প্রাধান্য লাভ করায়,—অন্য নানা কারণে অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও,—প্রাচীন গ্রীক বা রোমকদিগের ন্যায় হিন্দুজাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

বিধাতার বিড়ম্বনায় হিন্দুসমাজশরীর নানাবিধ রোগে আক্রান্ত ও নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু উহার অবস্থা একেবারে চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়া পড়ে নাই। হিন্দুসমাজান্তর্গত বাঙ্গালিজাতির অবস্থা কিছু অধিক শোচনীয় হইয়াছে। তথাপি তাহার হতাশ হইবার মত অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই। আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের শরীর বিবিধ কঠিন ও জটিলরোগে আক্রান্ত হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু রীতিমত চিকিৎসিত হইলে, এখনও তাহার আরোগ্য লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অগ্রে রোগ নির্ণয়, পরে চিকিৎসা। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা বঙ্গীয়সমাজশরীরগত রোগের পর্য্যালোচনায় প্রয়াস পাইব।

আধুনিক বাঙ্গালিজাতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবার বহুবিধ কারণ এক সঙ্গে উপস্থিত হওয়ায়, তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকালমৃত্যুর পরিমাণ অতি অল্পকালের মধ্যে এরূপ শোচনীয়ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইতেছে। যে যে কারণে আধুনিক বাঙ্গালিজাতি সুখ, শান্তি ও বিমল স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত হইয়াছে এবং যে যে কারণে তাহারা নিরন্তর রোগ, শোক, তাপ ও ক্লেশজীর্ণ দেহভার বহন করিয়া, অকালে কালের করালকবলে নিপতিত হইতেছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে ম্যালেরিয়াকে একটী প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যে ভীষণ ব্যাধির প্রবল পীড়নে সুসমৃদ্ধ, স্বাস্থ্য ও শান্তিপূর্ণা বঙ্গভূমি দারিদ্র্য, নির্জ্জীবতা ও অশান্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, কৃতান্ত দূত সদৃশ সেই ম্যালেরিয়ার সহিত সেকালের লোকের কোনও পরিচয় ছিল না। কেবল একালের লোকের দেহে উহার সর্ব্বসংহারক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া, প্রতিদিন সহস্র সহস্র বঙ্গীয় নরনারীকে অকালে শমনসদনে

প্রেরণ করিতেছে। এই দুরন্ত ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ, তাহার সবিশেষ আলোচনা করিবার স্থান উপস্থিত প্রবন্ধে নাই। ম্যালেরিয়া কথাটা বিদেশীয়। দুইটী লাটিন শব্দের সংযোগে উহার উৎপত্তি,—অর্থ দূষিত বাষ্প। আজি কালিকার দিনে দূষিত বাষ্প উৎপন্ন হইবার পক্ষে কারণের অসদ্ভাব নাই। তন্মধ্যে আমরা অন্য একটী মাত্র কারণের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। একালে রেলপথের কল্যাণে এবং রেলপথ-সমূহকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক নদনদীর একপার্শ্বে বাঁধ প্রস্তুত হওয়ায়, বৃষ্টি ও বন্যার জলরাশি যথাযথভাবে নিষ্কাশিত হইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিতেছে। আবার পক্ষান্তরে নদীর অন্যপার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহ বন্যার জলে অত্যধিক মাত্রায় প্লাবিত হইতে থাকায়, সেই সমস্ত জলরাশিও সম্যক্‌রূপে নির্গত হইতে পারে না। এইরূপে বৃষ্টি ও বন্যার জলসমূহ দেশ মধ্যেই বসিয়া যায় এবং অনেক স্থানের রুদ্ধ জল নানা জাতীয় লতাগুল্মাদিসহ পচিয়া, একটা অতি বিকট দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। রৌদ্রের প্রখর তাপে যখন সেই সকল আর্দ্রভূমি ও রুদ্ধ জলসমূহ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, তখন একটা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইয়া, সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে কলুষিত করে। সেই দূষিত বায়ুর সাহায্যে বিবিধ রোগবীজ মানবশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, দেশব্যাপী সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে। সেকালে বর্ষা ও বন্যার জলে দেশের সমস্ত আবর্জ্জনা ও ক্লেদাদি ধৌত হইয়া যাইত; সুতরাং ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা বা বসন্তাদি কোনও দেশব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি সেকালের লোকের দেহে তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। বসন্ত বিসূচিকাদি রোগ সময়ে সময়ে নানা কারণবশতঃ প্রবল হইলেও, ম্যালেরিয়ার দ্বারা সেকালের লোকে কখনই আক্রান্ত হইত না। পূর্ব্বের মত একালে দেশের ক্লেদাদি ধৌত বা বিদূরিত হওয়া দূরে থাকুক, তৎসমুদয় সহ বর্ষা ও বন্যার জল দেশ মধ্যেই থাকিয়া যাইতেছে এবং বর্ষা গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ,—এই মাসত্রয়ে তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে।

মনুষ্যের দেহ ও জীবনরক্ষার পক্ষে বায়ু, জল ও অন্নই সর্ব্বপ্রধান উপায়। এই তিন বস্তু ভিন্ন মানুষ কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না। ঐ তিনের বিশুদ্ধি ভিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষা হওয়াও অসম্ভব। উহাদের মধ্যে একতমের ঈষন্মাত্র ব্যতিক্রমেই স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে। আজিকালি দেশের বায়ু কিরূপে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে জলের কথা বলা আবশ্যক। একালে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে নিতান্ত দূষিত, পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় ও নানা রোগবীজপূর্ণ জলপান করিয়া, পল্লীগ্রামের লোকের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, দেশব্যাপী ও সংক্রামক জ্বর, বিসূচিকা ও বসন্তাদি রোগে লোকে দলে দলে কিরূপে অকালমৃত্যুর

কবলগত হইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন; সুতরাং তাহার অধিক বর্ণনা অনাবশ্যক।

একালে যেরূপ বিশুদ্ধ পানীয় জলের একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। সেকালে স্নান ও পানের জন্য দেশে প্রচুর জলাশয় বিদ্যমান ছিল। ধর্ম্ম ও পরোপকারের জন্য সেকালের লোকে অসংখ্য দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিত। আর একালের লোকের জলাশয় প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হওয়ায়, নূতন জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রাচীনগুলিও ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, অনেক গ্রামে একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছে। এমন কি, গ্রামান্তর হইতে জল না আনিলে, অনেক গ্রামের অধিবাসিগণের জীবনরক্ষা হয় না। যাহাদের গ্রামান্তর হইতে জল আনিবার উপায় নাই, নির্ম্মল জলের অভাবে তাহা-দিগকে বাধ্য হইয়া, স্বগ্রামস্থ সেই কর্দ্দমাক্ত রোগবীজপূর্ণ জলপান করিয়া, স্বাস্থ্যনষ্ট ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইতেছে।

আহারের দোষে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কদর্য্য সামগ্রীর আহার আজি-কালিকার দিনে এক প্রকার অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। চাউল, দাল, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল ও ময়দা প্রভৃতি একালে আর খাঁটি পাওয়া ভার হইয়াছে। সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যেই নানাপ্রকার অখাদ্য, অনভ্যস্ত ও দুষ্পাচ্য পদার্থ মিশ্রিত থাকা সত্বেও, বাধ্য হইয়া, তাহাই সকলকে ভোজন করিতে হইতেছে। ঘৃত তৈলাদিতে সময়ে সময়ে এরূপ দুর্গন্ধ দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুভূত হয় যে, উহা গলাধঃকরণ করিতে পারা দূরে থাকুক, নাসিকার নিকট লইয়া যাইবামাত্র লোকের বমনোদ্রেক হইয়া থাকে। উদরের জ্বালায় একালের লোকদিগকে সেই সকল ঘৃত তৈলাদিতে পাক করা সামগ্রী খাইতে হয়। সেকালের সেই হৈয়ঙ্গবীন ও বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল একালের লোকের—বিশেষতঃ নগরবাসিগণের নিকট যেন আষাঢ়ে গল্প বলিয়া বোধ হয়। ঐ সকল কদন্ন ভোজনের অনিষ্টকারিতায় আজি কালি দেশের লোকে স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইতেছে।

জল বায়ু ও আহার,—এই ত্রিবিধ বস্তুর উপর যখন মানবজাতির স্বাস্থ্য বা আরোগ্য নির্ভর করিতেছে, তখন ঐ তিনের বিকৃতি ঘটিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যসুখ-লাভের সম্ভাবনা কোথায়? সেকালে দেশে নির্ম্মল জল বায়ু ও বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রী ছিল; সুতরাং দেশের লোকের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিত।

দারিদ্র্য—আধুনিক বঙ্গের স্বাস্থ্যহানির একটী প্রধান কারণ। অনাহার সর্ব্ববিধ রোগের জনক। খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের অন্নকষ্টও ক্রমশঃ

বৰ্দ্ধিত হইতেছে। দুই সন্ধ্যা উদরপূর্ত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অনেক দরিদ্র গৃহস্থের এক সন্ধ্যাও পূর্ণ আহার জুটে না। সেকালের লোকের আর যত বিষয়েরই অভাব থাকুক না কেন, তাহাদের দুই বেলা আহার জুটিত। অন্যান্য বিষয়ে তাহারা তাদৃশ অভাবও অনুভব করিত না। আপনাপন অবস্থায় তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। একালে যে সামগ্রী যে মূল্যে পাওয়া যায়, সেকালে সেই মূল্যে তাহার চতুর্গুণ বা ততোধিক সামগ্রী পাওয়া যাইত। চাউল, দাল, ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য ও মাংসাদি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যই সেকালে প্রচুর ও সুলভ থাকায় কাহাকেও অনাহারে কষ্ট পাইতে কিংবা খাদ্যাভাবে রোগগ্রস্ত হইতে হইত না।

এখনকার দিনে বাঙ্গালিজাতির আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন এতদ্দেশীয় জনগণের প্রকৃতির অনুকূল নহে। স্কুলের বালকেরা ও আফিস আদালতের কর্ম্মচারী বা উকীল মোক্তারেরা প্রাতে ৯টার সময় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, বিদ্যালয় ও স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে গিয়া উপস্থিত হন। মধ্যাহ্নকাল পিত্তের কাল, পিত্ত ভিন্ন কোনও দ্রব্য জীর্ণ হয় না। আবার পিত্তের কালে যেরূপ পিত্ত নিঃসরণ হয়, কফ বা বায়ুর কালে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। কফ বা বায়ুর কালে আহার করিলে এবং ঐ সময়ে আহার করা অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে, পরিপাক কার্য্যের অনুরোধে ক্রমাগত অকালে পিত্ত নিঃসরণ-হেতু পিত্তের প্রকোপবশতঃ নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ মধ্যাহ্নকালকেই ভোজনের উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আজিকালি দেশের বহুসংখ্যক লোককে কার্য্যানুরোধে বাধ্য হইয়া, মধ্যাহ্নের অনেক পূর্ব্বে—কফের কালে আহার করিতে হয়। আহারের অব্যবহিত পরে অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকের প্রাক্কালে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা একান্ত নিষিদ্ধ; কিন্তু আজি কালি ঠিক সেই সময়েই দ্রুতপদে স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক বা মানসিক শ্রমে নিযুক্ত হইতে হয়। তাহার বিষময় ফলে কি বালক, কি যুবক, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ সকলেরই পিত্ত নিতান্ত বিকৃত হইয়া, অম্লপিত্ত, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল রোগ প্রায় তাহাদের চিরসঙ্গী হইয়া পড়ে। ছাত্রগণ এক একটী পরীক্ষায় দশ দশ বৎসরের পরমায়ু ক্ষয় করিয়া, দ্বাবিংশতি বৎসরে পঞ্চাশদ্বর্ষবয়স্কের মত হইয়া কলেজ হইতে বহির্গত হয়েন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া, অর্দ্ধমৃতের মত বোধ হয়। তাহার পর তাঁহাদের জীবনের অবশিষ্ট অংশটী নানাবিধ রোগে ভুগিতে ভুগিতেই অতিবাহিত হইয়া থাকে। আমরা ৭০।৮০

বৎসরের বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিতে পাই, একালের লোকেরা অম্লপিত্ত বা যকৃদ্ রোগে যেরূপ কষ্ট পাইতেছে এবং অনুসন্ধান করিলে, যেরূপ অধিকাংশ লোকেরই উক্ত রোগদ্বয়ের কথা শুনা যায়, সেকালে সেরূপ শুনিতে পাওয়া যাইত না। আজিকালি শতকরা প্রায় ৯০ জনের অম্লপিত্ত রোগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং দুই এক দিন জ্বর হইবামাত্র যকৃতে বেদনা না হয়, এরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। একালে পিত্ত প্রকোপের নানাবিধ কারণ নিত্য সঙ্ঘটিত হইতে থাকায়, যকৃতের বিকৃতি এবং পিত্তজন্য বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। আর সেকালের লোকেরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, পাঠার্থী, শিক্ষক ও কর্ম্মচারিগণ ধীরে সুস্থে পাঠশালা বা কর্ম্মস্থানে গমন করিত। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্নানাহার সমাপনের পর তাহারা কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভের অবকাশ পাইত। ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হওয়ার পর পুনরায় অপরাহ্নকালে কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা স্বকার্য্যসাধনে নিযুক্ত থাকিত। উপযুক্ত সময়ে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ সামগ্রীর আহার, উপযুক্ত সময়ে বিশ্রাম এবং উপযুক্ত সময়ে পরিশ্রমহেতু তাহাদের দেহ ও মন সুস্থ থাকিত। আহার করিবার শক্তিও যেরূপ ছিল, দেহে বলও তদনুরূপ থাকায়, সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া, মনের সুখে তাহারা দিনপাত করিত। পরিপাকশক্তির অভাব বা পিত্তবিকৃতিজন্য কোন প্রকার উৎকট রোগ সেকালের লোকদিগকে ভোগ করিতে হইত না। আমরা একালের পাঠশালা বা চতুষ্পাঠীর ছাত্র, শিক্ষক বা অধ্যাপক ও জমিদারী সেরেস্তার কর্ম্মচারিগণের শারীরিক অবস্থার সহিত স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক বা অধ্যাপক এবং আফিস আদালতের কর্ম্মচারী ও উকিল মোক্তার প্রভৃতির শরীরের অবস্থার পরস্পর তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখিতে পাই।

পানদোষ বা মাদক সেবনকে আমরা একালের লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার পক্ষে একটী বিশেষ কারণ বলিয়া মনে করি। সেকালে সুরাপান বা অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকলের ব্যবহার বহুগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। আজিকালিকার বাজারে একটুকু আধটুকু সুরাপান না করিলে বাবু বা সাহেব হওয়া যায় না। সন্ধ্যার সময় যে কোনও প্রকারের কিঞ্চিৎ মাদকদ্রব্য সেবন না করিলে, একালের অনেক লোকের "ধাত" ঠিক থাকে না,—নাড়ী ঠাণ্ডা হইয়া যায়। উচ্চপদস্থ পরিদর্শক কর্ম্মচারী মফস্বলে বাহির হইলেন, সঙ্গে ব্রাণ্ডি ও কুইনাইন চলিল। কি জানি, পাছে ম্যালেরিয়া নামক জীবাণু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে! অনেক বালক পঠদ্দশা হইতেই মাদক

সেবনে প্রবৃত্ত হয়। সে সময় দরিদ্র ছাত্রগণের পক্ষে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া, সুরাপান করিবার তাদৃশ সুযোগ ঘটে না; সুতরাং তখন তাহারা "সস্তার নেশা" সিদ্ধি বা চরস খাইতে আরম্ভ করে। আজিকালি আবার অনেক বালক কোকেন খাইতে শিখিয়াছে। কোকেন সেবনের পরিণাম অন্যান্য মাদক সেবন অপেক্ষা শতগুণে শোচনীয়। বিশ বৎসর গুলি সেবন করিলে, মানুষের মূর্ত্তি যেরূপ কদর্য্য হয়, বোধ হয়, ছয় মাস কোকেন খাইলেই তদ্রূপ হইয়া যায়। দীর্ঘকাল কোকেন সেবনে লোকে নানাবিধ উৎকট ও অসাধ্য রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আবকারির আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, এই বঙ্গদেশে মাদকদ্রব্যের বিক্রয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মাদকদ্রব্যের বিক্রয়ও বাড়িয়া থাকে। আমরা নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, যদি কেহ অপরাহ্নে আফিমের দোকানের সম্মুখে কিয়ংক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি দেখিতে পাইবেন, দলে দলে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সিদ্ধি ও চরস ক্রয় করিতেছে। আজি কালি সিগারেটের প্রচলন শোচনীয়ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে। দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে আরম্ভ করিয়া, পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই মুখে সিগারেট বিরাজ করিতেছে। যখন যাহাদের অধঃপতনের সময় হয়, তখন তাহাদের অনেক প্রকার উপসর্গ আসিয়া জুটে; সুতরাং বহু উপসর্গের উপর "চা" এক নূতনতর উপসর্গ জুটিয়াছে। ফলতঃ ঐ সকল মাদকদ্রব্য ও চা প্রভৃতি নিতান্ত পিত্তপ্রকোপের বহুবিধ কারণ একসঙ্গে উপস্থিত হওয়ায়, একালের লোকের এত যকৃদ্ রোগের প্রাদুর্ভাব না হইবে কেন?

ক্রমশঃ—

কবিরাজ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন।

ঔষধ-প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী।

চ্যবনপ্রাসের গুণ-বীর্য্য-প্রভাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রায় সমস্ত দ্রব্য এক বা তদধিক রস বিশিষ্ট। কোন দ্রব্য মধুর, কোন দ্রব্য অম্ল, কোন দ্রব্য কটু, কোন দ্রব্য তিক্ত, কোন দ্রব্য কষায়, কোন দ্রব্য বা লবণ রস যুক্ত। সহু দ্রব্যে দুই বা তদধিক রসের মিশ্রণ বিদ্যমান রহে। দ্রব্যের গুণ,—বীর্য্য এবং বিপাক রসায়ত্ত; শক্তি বা প্রভাব দ্রব্যনিষ্ঠ বিশিষ্ট ধর্ম্মমাত্র। যেমন মধুর রস বাতঘ্ন বায়ুবর্দ্ধক উষ্ণবীর্য্য এবং তিক্তরস পিত্তঘ্ন ও শীতবীর্য্য ইত্যাদি।

বলিয়াছি যে দ্রব্যের শক্তি বা প্রভাব দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মমাত্র। উহা রসায়ত্ত নহে—স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যেমন ভেদকতা জয়পালের ধর্ম্ম, বামকতা তুঁতের ধর্ম্ম ইত্যাদি। পরন্তু "প্রতিনিয়ত শক্তিকানি ভেষজ দ্রব্যাণি"। অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধ দ্রব্যের এক বা তদধিক প্রতিনিয়ত শক্তি থাকে। সেই প্রতিনিয়ত শক্তির নামই প্রভাব। প্রভাব বিশিষ্ট দ্রব্য যে কোন প্রকারে শরীর গত হইলে স্বাতন্ত্র্যশক্তি প্রকাশ করে। যেমন ক্যাষ্টর অইল্ পান করিলে উদরদেশে মালিশ করিলে অথবা সিরিঞ্জিযোগে মলমার্গ দিয়া প্রবেশ করাইলে মলাদি ভেদ হয়। ভেদ করাই ক্যাষ্টর অইলের প্রতিনিয়ত শক্তি বা প্রভাব। তুঁতিয়া প্রভৃতি বামক দ্রব্য দ্রব করিয়া পান করিলে, পিচ্‌কারী যোগে মল পথ দিয়া প্রয়োগ করিলে অথবা হাইপোডার্ম্মিক্ সিরিঞ্জ যোগে শিরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলে বমন উপস্থিত হয় সুতরাং বামকতা তুঁতিয়ার প্রতিনিয়ত শক্তি বা প্রভাব।

চ্যবনপ্রাশ অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায়-ভূয়িষ্ঠ মধুর রসযুক্ত নাতি-শীতোষ্ণ বীর্য্য ঔষধ সুতরাং নানাপ্রকার বায়ু-পিত্ত-কফ সম্ভব দ্বন্দ্বজ এবং সন্নিপাত রোগে হিতকর; প্রভাববশতঃ নানা রোগ প্রশমন করে।

সেব্যমান চ্যবনপ্রাস পরিপাক প্রাপ্ত হইলে উহার রস বীর্য্য রক্ত ধাতুগত হয় তদনন্তর স্বীয় গুণ ও প্রভাব প্রকাশ করে। ঔষধ পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিলে সুফল ফলে না, পরন্তু ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি অফলের উদয় হইতে থাকে। তজ্জন্য কোষ্ঠের অগ্নিবলাদি পরীক্ষা করিয়া চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। যাহার কোষ্ঠে যে পরিমিত ঔষধ সুজীর্ণ হয় তাহার পক্ষে তাবৎ পরিমিত ঔষধ হিতকর। অতিমাত্র ঔষধ সেবনে ক্ষুধামান্দ্য হব, কোষ্ঠে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইতে থাকে এবং উদ্গারে ঔষধের গন্ধ অনুভূত হয়। অতিমাত্র ঔষধ অহিতকর।

সেব্যমান চ্যবনপ্রাশ জীর্ণ হইতে থাকিলে শরীরে নানাপ্রকার সুফদের উদয় হইতে থাকে—শ্বাসযন্ত্রে বিন্যস্ত স্নায়ুজাল ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, তজ্জন্য ফুপ্‌ফুস্ * কোষ্ঠে রক্তধাতুর সুখ সঞ্চারের বাধা বিদূরিত হয়। সুতরাং ক্রমশঃ ফুপ্‌ফুসের বলবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং প্রাণবায়ু অনুলোম হইয়া উঠে অর্থাৎ বিরুদ্ধগতি পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে গমনাগমন করিতে থাকে। বায়ুর অনুলোমতা বশতঃ ফুপ্‌ফুস কোষ সমূহে সঞ্চিত শ্লেষ্মা অনায়াসেই উঠিয়া যায় পরন্তু চ্যবনপ্রাসের শক্তিবশতঃ শ্লেষ্মসঞ্চয়ের বাধা উপস্থিত হয়। সুতরাং বায়ুকোষে শ্লেষ্মসঞ্চয়ের আদৌ অল্পতা হইয়া ক্রমশঃ অভাব হয় এই জন্য চ্যবনপ্রাশ কাসরোগে পরমোপকার সাধন করে।

ফুপ্‌ফুস কোষ্ঠে বিন্যস্ত শিরা কিম্বা ধমনী * ছিন্ন বা ভিন্ন হইলে অথবা কোন কারণে তথায় ক্ষত হইলে রক্তবমন বিম্বা রক্ত নিষ্ঠীবন হইতে থাকে। এই সকল রোগে চ্যবনপ্রাশ হিতকর। চ্যবনপ্রাশের গুণ-বীর্য্য প্রভাব বশতঃ শিরাধমনীর ছিন্ন-ভিন্নাবয়ব সংহিত হয় অর্থাৎ যুড়িয়া যায় তজ্জন্য রক্তপিত্ত এবং উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত হয়।

শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয়রোগগ্রস্ত পরন্ত ক্ষীণ শুক্র হীনবল শীর্ণমাংস রসায়নার্থীকে চ্যবনপ্রাস ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

অধুনা যে যে উদ্দেশ্যে ডাক্তারেরা কডলিবর অইল্ ব্যবস্থা করিয়া স্থল বিশেষে অতি বিলম্বে ফললাভ করেন, তত্তদ্ উদ্দেশ্যে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিলে প্রায়শঃ ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয় না পরন্তু সত্বর সুফল লাভ করা যায়।

চ্যবনপ্রাশের মাত্রা অর্দ্ধ তোল হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম অল্প মাত্রায় প্রয়োগ আরম্ভ করিবে। ঔষধ স্বচ্ছন্দে জীর্ণ হইতে থাকিলে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। কিশোর বয়স্ক এবং বালকদিগকে অর্দ্ধ ও শিকি মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বল্‌কা গব্যদুগ্ধের সহিত, মধুযোগে এবং প্রয়োজনানুসারে ক্বাথাদির সহিত চ্যবনপ্রাস প্রয়োগ করিতে হয়।

পুরাতন কাস, ক্ষয়কাস এবং ক্ষয়রোগে নিম্নলিখিত কষায়ের সহিত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিলে অত্যন্ত সুফললাভ করা যায়।

---

* অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় ফপফুস শব্দের পরিবর্ত্তে ফস্‌ফুস শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

বাসকমূলের ছাল ১ তোলা, যষ্টিমধু।০ শিকি, অনন্তমূল।০ শিকি, তেজপত্র।০ শিকি এবং কিচমিচ।০ সিকি একত্র পেষণ করিয়া ৩২ তোলা জল সহ পাক করিবে। ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত উপযুক্ত পরিমিত চ্যবনপ্রাশ গুলিয়া পান করিতে দিবে।

সম্পাদক।

স্বর্ণবঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ-ভাণ্ডারে ঔষধ-রত্নের অসদ্ভাব নাই। স্বর্ণবঙ্গ সেই সমস্ত রত্নের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ রত্ন। সুকল্পিত স্বর্ণবঙ্গ, নিয়মস্থ রহিয়া, উচিত মাত্রায় সেবন করিলে নানাপ্রকার প্রমেহ এবং হীনশুক্র ও ক্ষীণশুক্র প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। কিন্তু কুকল্পিত স্বর্ণবঙ্গ নানা অনর্থের হেতু। দীর্ঘকাল যাবৎ নানা দিগ্ দেশীয় শঠ ব্যবসায়ীরা অবিশুদ্ধ উপাদান যোগে প্রস্তুত মনঃশিলা রাগরঞ্জিত স্বর্ণবঙ্গ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। কবিরাজ মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই তাহা অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া চিকিৎসার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাদৃশ ঔষধে সুফল পাওয়া যায় না কিন্তু কুফলের ত্রুটী ঘটে না।

স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করা কঠিন কাজ নহে, একটু আয়াস ও যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করিয়া তৈয়ার করিয়া লইলে সকল দিক্ বজায় থাকে—চিকিৎসকেরও যশঃ এবং অর্থলাভ হয়, রোগীও আরোগ্য লাভ করে।

যাঁহারা স্বহস্তে স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে প্রস্তুতি কৌশল লিখিত হইল।

হিঙ্গুলোত্থ রসের নপুংসক দোষ শোধন করার নিয়ম পূর্ব্বে বলিয়াছি। নপুংসক দোষ বিরহিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা, শোধনকরা বঙ্গধাতু অর্থাৎ রাং ৮ তোলা, শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা এবং ভাল নিশাদল ৮ তোলা যোগে প্রক্রিয়া বিশেষে স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে হয়।

হিঙ্গুল হইতে পারা বাহির করা ও তাহার নপুংসক দোষ প্রশমন করা এবং গন্ধক শোধন করার নিয়ম পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই স্থলে রাং শোধনের নিয়ম কথিত হইতেছে।

পদ্মরাং নামে পরিচিত যে বঙ্গধাতু বাজারে বিক্রয় হয়, তাহাই শোধনার্থ গ্রহণ করিবে। আবশ্যকানুরূপ বঙ্গধাতু, একখানি পরিষ্কার লৌহ বা মৃৎকটাহে রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে দ্রব করিতে হইবে। দ্রবীভূত বঙ্গ প্রথমতঃ একটী উপযুক্ত

পাত্রে স্থিত তিল তৈলে ঢালিয়া দিবে। তিল তৈল হইতে জমাট বাঁধা রাং উঠাইয়া পুনরপি কটাহে রাখিয়া দ্রব করিবে এবং তৈলে নিঃক্ষেপ করিবে। তিনবার এইরূপ করা হইলে, পুনর্ব্বার দ্রব করিয়া মৃত্তিকা বা পাথরের পাত্রে রক্ষিত তক্রে নিক্ষেপ করিবে। তক্রমধ্যে অতি সাবধানে ফেলিতে হয়; সহসা নিক্ষেপ করিলে তক্রের সঙ্গে বঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তাহাতে নিক্ষেপ কারীর বিপদেরও সম্ভাবনা। পাত্রের পার্শ্ব দিয়া ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিলে সেরূপ ঘটে না। তক্রে তিনবার নিষেক করা হইলে, গাই গরুর চোণায় ঐরূপে ৩ বার নিষেক করিতে হয়। তারপর কাঁজিতে ৩ বার, তদন্তর কুলথ অর্থাৎ কুল্‌থি কলায়ের ক্বাথে ৩ বার নিষেক করিলে বঙ্গধাতু বিশুদ্ধ হয়।

পারদ প্রভৃতি দ্রব্য চতুষ্টয়ের মিশ্রণ প্রণালী।

অগ্রে একখানা উত্তম পরিষ্কার লোহার খল এবং একটী লোহার দণ্ড অভাবে সুমার্জ্জিত সুদৃঢ় পাথরের খল ও দণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। আর একখানা উত্তমরূপে মাজাঘসা ছোট কটাহ সংগ্রহ করিতে হইবে।

কটাহখানি চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া তাহাতে ৮ তোলা শোধিত বঙ্গ রাখিয়া মৃদু আগুণের তাপে গলাইয়া তাহাতে ৮ তোলা শুদ্ধ পারদ নিঃক্ষেপ করত একটী স্থূল লৌহ শলাকা দ্বারা আবর্ত্তন করিতে হইবে। সেই আবর্ত্তিত পারদ এবং বঙ্গের মিশ্রণ, খলে ঢালিয়া দিবে। জমিয়া গেলে দণ্ড দ্বারা মাড়িয়া মাড়িয়া গুঁড়া করিয়া তাহাতে ৮ তোলা শোধন করা গন্ধক দিয়া বহুক্ষণ মাড়িবে। বঙ্গ, পারদ, গন্ধকের মিশ্রণ কজ্জলাভ হইলে তাহাতে ৮ তোলা নিশাদল চূর্ণ দিয়া আরও কিছুক্ষণ মাড়িয়া লইবে। সেই চূর্ণীভূত সমস্ত দ্রব্য বোতলের মধ্যে রাখিয়া বালুকা যন্ত্রে চারি প্রহর কাল পাক করিতে হয়।

পাক প্রণালী—যে বোতলের তলদেশ উৎক্ষিপ্ত নহে—বেশ সমতল, স্কন্ধদেশ টানা নহে বেশ চাপা এবং মুখনল সরল সেইরূপ একটী কাল বর্ণের পুরু বোতল গ্রহণ করিবে। এইরূপ বোতলকে সচরাচর গেঁটে বোতল বলে। বোতলের অভ্যন্তরভাগ বেশ পরিষ্কার হওয়া চাই।

ভাল আঠাল মাটী চূর্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ বালি মিশাইয়া উপযুক্ত পরিমিত জল দিয়া ছানিবে। উত্তমরূপে ছানা কাদা দিয়া বোতলের তলদেশ এবং অপর সমস্ত বহির্ভাগ আধ আঙ্গুল পুরু লেপ দিবে। লেপের উপর তরল পঙ্কলিপ্ত একখানা বস্ত্রখণ্ড দিয়া বেষ্টন করত রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া লইবে।

ঐ প্রকার লিপ্ত বোতলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চূর্ণীভূত ঔষধ অতি সাবধানে পুরিবে এবং মাটী, ইট বা চা খড়ির একটা কর্ক অর্থাৎ কাক দিয়া বোতলের মুখ রোধ করিবে। কাকটী যেন বোতলের মুখে সুসংশ্লিষ্ট হইয়া রহে—একটুও ফাঁক না থাকে।

যে স্থালীর অর্থাৎ হাঁড়ীর অভ্যন্তরের মধ্যস্থলে লিপ্ত ঔষধপূর্ণ বোতলটী বসাইলে সকল দিগে অন্ততঃ পক্ষে আট আঙ্গুল অবকাশ থাকে এরূপ একটী দৃঢ় হাঁড়ী গ্রহণ করত, তাহার তলদেশের মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ যায় আসে এরূপ ছিদ্র করিলেই হইবে। তারপর বোতলটী হাঁড়ীর মধ্যস্থলে স্থাপন করত পরিষ্কার সাদা বালি দিয়া হাঁড়ীটী পূর্ণ করিবে, মুখনলের দুই আঙ্গুল বাদ রহিবে। সেই দুই আঙ্গুল লবণ দিয়া পুরিয়া দিবে।

উক্তরূপে বিরচিত যন্ত্র উপযুক্ত চুল্লীতে স্থাপন করত চারি প্রহর কাল তীব্র জ্বাল দিতে হইবে। চারি প্রহরের পর আর জ্বাল দিবে না, কিন্তু চুল্লীর উপরই রাখিয়া দিবে। তৎপর দিন সাবধানে বোতল উঠাইয়া লেপটী খুলিয়া বোতল ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তস্থ স্বর্ণ বঙ্গ গ্রহণ করিবে।

সম্পাদক।

জ্বরাদৌলঙ্ঘনং পথ্যং।

এই শ্লোকাংশের অর্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে গুরুতর ভ্রম রহিয়াছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে অনেকেই জ্বররোগীকে পথ্য ব্যবস্থা করিলে ঐ শ্লোকাংশ পাঠ করিয়া লঙ্ঘন ব্যবস্থার ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। অনেক আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীরও ঐ ভ্রান্ত ধারণা থাকায় বিষয়টী আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল কারণে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

জ্বরাদৌ অর্থ কি? জ্বরের আদি। আদি কি? উৎপত্তির পূর্ব্ব অথবা উৎপন্ন হওয়ার পর ভোগের প্রথমাবস্থা? অর্থাৎ জ্বর হয় নাই এই অবস্থা জ্বরাদি কিম্বা জ্বর হইয়াছে তাহার প্রথম কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন জ্বরাদি? শেষোক্ত ব্যাখ্যা যথার্থ নহে কারণ বলা যাইতেছে।

জ্বরের ভোগকালের কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। সাধারণ জ্বর ১।২ দিবসে সারিয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিকাদি, পালা জ্বরের ভাব ধারণ

করিলে ৪ ঘণ্টা ৫ ঘণ্টা বড় জোর ১২ ঘণ্টা ভোগ করিয়া থাকে। সন্নিপাত বিকারে নানা প্রকারে নানা রকম ভোগ হয়। পিত্তশ্লেষ্ম বিকার (Pneumonia) ৭—১১ দিন বাতশ্লেষ্ম বিকার ৪ সপ্তাহ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখন রোগী চিকিৎসককে ডাকিলে তিনি কয় ঘণ্টা বা কয় দিবসকে আদি অর্থাৎ প্রথমাংশ সাব্যস্ত করিবেন ও লঙ্ঘন ব্যবস্থা করিবেন? অধিকাংশস্থলেই জ্বরের ভোগকাল চিকিৎসক প্রথম দর্শন মাত্র বলিয়া দিতে পারেন না। এমন কি, কি যে দাড়াইবে তাহা পর্য্যন্ত অনেক জ্বরে প্রথম এক দুই দিন টের পাওয়া যায় না। এরূপস্থলে আদি শব্দে জ্বরের প্রথমাংশ বুঝিতে হইলে চিকিৎসককে ভবিষ্যৎবক্তা হইতে হয়। শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহা কোনরূপেই হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ অন্বয়গত অর্থও দেখুন। ঐ শ্লোকের একাংশ "জ্বরান্তে লঘু ভোজনং"। ভোগ কালের আদৌ বলিলে যদি প্রথমাংশ বুঝিতে হয় তবে "অন্তে" বলিলে ভোগ কালের শেষ ভাগ অর্থাৎ জ্বর ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিবস পূর্ব্বে বোঝা উচিত। এখানেও কয় ঘণ্টা বা কয় দিবস পরে জ্বর ত্যাগ হইবে তাহা জানিবার জন্য চিকিৎসকের জ্যোতিষী হইতে হইবে। আর জ্বর দেহে থাকিতে কোন ব্যক্তিই বা ভোজনের ব্যবস্থা দিবে। লঘু ভোজন অর্থ লঘু পথ্য নহে, পথ্য আর ভোজনের পার্থক্য মনে রাখিবেন। ভোজন অর্থে নিত্য ব্যবহার্য্য অন্ন ব্যঞ্জনাদির আহার তাহাই যেন লঘু হয় সেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ দেহে রোগ থাকে তৎক্ষণ যে আহার ব্যবহারাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাকে বরাবর পথ্যই বলা হইয়াছে কোথাও ভোজন বলা হয় নাই হাতের কাছেই দেখুন—"জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং"।

মোট কথা এই যে "আদৌ" ও "অন্তে" এই উভয় পদেই অভিবিধির ভাব রহিয়াছে; মর্য্যাদার ভাব নাই। অভিবিধি অর্থাৎ exclusion মর্য্যাদা inclusion জ্বর হয় নাই তখন হইল জ্বরাদৌ এবং জ্বর ছাড়িয়া গেল হইল "জ্বরান্ত"। জ্বরের ভোগ কালেরই আদ্য ও শেষভাগ নহে।

ভাল, জ্বর না হওয়া পর্য্যন্ত যদি জ্বরাদি হয় তবেত আমরা সকলেই এখন "জ্বরাদি" অবস্থায় আছি, তবে কি আমাদের উপবাসের ব্যবস্থা হইতেছে না কি? সেও মন্দ নয়? না তাহা নহে। আয়ুর্ব্বেদে অধিকাংশ রোগ সম্বন্ধেই কতকগুলি পূর্ব্বরূপ লিখা হইয়াছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট রোগ দেখা যাইতেছে না অথচ এক ব্যক্তির অসুস্থতার কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদবিৎ বলিতে পারেন যে শীঘ্রই এই ব্যক্তির অমুক রোগ হইবে; ইহাকেই পূর্ব্বরূপ কহে।

জ্বরেরও পূর্ব্বরূপ লিখিত আছে যথা—কিছু ভাল লাগে না, বিরসতা, চক্ষু ছল ছল করে, কখন শীত ভাল লাগে কখন রৌদ্র ভাল লাগে কখন বাতাস ভাল লাগে কখন কখন ঐগুলি নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হয়, রোমাঞ্চ হয় গা মোচড়ায়, হাই উঠে, চক্ষু জ্বালা করে ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া কিছুক্ষণ পরে যথার্থ জ্বর প্রকাশ পায়। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই উপবাস করিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রের মত এবং বহুদর্শিতার অনুকূল। ঐ সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ হইলে যদি ভোজন করা যায় তাহা হইলে জ্বরের বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়, শীত কম্প অতি ভয়ানক ও কষ্টদায়ক হয়, অগ্নি বিকৃত হইয়া উদরাময়াদি উৎপন্ন হয় এবং বহু উপদ্রবকে (Complication) ডাকিয়া আনে। এমন কি বমন করাইয়া উদর শূন্য না করিলে কিছুতেই সহজে জ্বরের বেগ কমে না। চলিত কথায় এইরূপ অবস্থাকে "ভাতে মুখে জ্বর আসা" বলে এবং ইহা কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা ভুক্তভোগী রোগী এবং তাহার চিকিৎসকই জানেন।

তবে কি জ্বরে উপবাস অনুচিত? অনুচিত নহে উচিতও নহে। এ বিষয়ে বারান্তরে বলা যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীতারকনাথ দেব।

বাঙ্গালার অবনতি ও বাঙ্গালীর অধোগতি।

বহুকাল হিন্দুর সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর ভারতবর্ষে হিন্দুর যে সমস্ত খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও আর এখন নাই। সাতশত বৎসরেরও অধিককাল হিন্দুস্থান অহিন্দুগণের আক্রমণাধীনে ও শাসনাধীনে রহিয়া বিবর্ত্তিত হইতে হইতে অধুনা অবনতির শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরের অধীন—ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড আমাদের সম্রাট। মহামহিমান্বিত ভারতসম্রাট্ জানেন যে ভারতবর্ষ নামে এক অতি বিশাল সাম্রাজ্য আমার শাসনাধীন রহিয়াছে, ভারতবাসীরা জানে যে তাহারা এড্ওয়ার্ডের প্রজা। রাজা প্রজার এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। ইহার অধিক আর কিছু আছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; থাকিলেও তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সমস্ত ভারতবর্ষ

ইদানীং সমবেত ইংরেজশক্তির বা ব্রিটিস্ শক্তির শাসনাধীন। ইংরেজ শাসনাধীনে এ দেশে যে যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা ভারতবাসীর অনুকূল নহে। সে যুগে বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্য বিলুপ্তপ্রায়, মানসিক শক্তি নির্ব্বাণোন্মুখ এবং দারিদ্র-দুঃখ তাহাদিকে নিষ্পেষণ করিতে সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াছে। যে যে কারণে এ দেশের নরনারী ইংরেজ শাসনাধীনে রহিয়া হতবীর্য্য, গতবল, ভ্রষ্টস্বাস্থ্য এবং দারিদ্র-গ্রস্ত হইতেছে, আমরা এই প্রবন্ধে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমতঃ শরীরের ও মনের স্বাস্থ্যভ্রংশের কথা বলা যাইতেছে।

ইংলণ্ড আর ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকৃতির দেশ। সে দেশ চারিটী ঋতুর বিরাজ-ক্ষেত্র, এ দেশ ষড়্‌ঋতুর বিহার ভূমি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ শীত প্রধান, ভারতবর্ষ গ্রীষ্মবহুল। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টার পূর্ব্বে এবং অপরাহ্ণ ৪টার পর, ঘরের বাহিরে কাজ করা শীত প্রধান দেশবাসিজনগণের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। সেই জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে, সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত বাহিরে কাজ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের দেশে সেইরূপ কর্ম্মকালের নির্দ্দেশ অনর্থকর। হিন্দুরাজার অধিকারকালে, তারপর মুসলমান রাজার আমলে সেরূপ নিয়ম ছিল না। তত্তৎকালে পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত লোকে কাজ করিত। তারপর স্নানাহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া আপরাহ্ণিক কাজে প্রবৃত্ত হইত। সেইরূপ কর্ম্মকাল এ দেশের লোকের স্বাস্থ্যের অনুকূল। ইংরেজরাজ এবং য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ তাঁহাদের অভ্যাসানুরূপ, এ দেশেও কর্ম্মকাল স্থির রাখিয়াছেন। তাঁহারা যাঁহাদের কার্য্যকাল নিরূপণ করিয়া দেন নাই, তাঁহারাও য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণে কার্য্যকাল নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন। উক্ত নিয়মে বাধ্য হইয়া আমরা স্বাস্থ্য ভ্রষ্ট হইতেছি। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি।

মধ্যাহ্ন ভোজনে এবং নৈশাহারে আমরা চিরাভ্যস্ত। সে অভ্যাস আমাদের শরীরের ও দেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। সুস্থ শরীরে হিত পরিমিত আহার করিলে দুই প্রহর কালের মধ্যে সে আহার সুজীর্ণ হয়। জাগ্রতকালে আহার পরিপাকের এইরূপ নিয়ম। দিনে ঘুমাইলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। রাত্রিকাল নিদ্রার প্রকৃত সময়। প্রাকৃত নিদ্রাকালেও আহার পরিপাক হইতে বিলম্ব ঘটে। তজ্জন্য রাত্রিকালে আমরা যাহা আহার করি, তাহা পরদিন এক প্রহরের মধ্যে সুজীর্ণ হয় না। তাই, "যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।" এই শাস্ত্রীয় বিধি আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত ও সুসঙ্গত। কিন্তু আমরা অযথা কর্ম্মকালের নিয়মে

বাধ্য রহিয়া সে বিধি পালন করিতে পারিতেছি না। বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে আমাদিগকে অধ্যশনে অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের আহার জীর্ণ না হইতে ভোজন করিতে বাধ্য হইতে হয়। অধুনা বহুস্থানে রেইল্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বহু নদনদীতে ষ্টীমার যাওয়া আসা করে। সেই সুযোগে বাড়ীর ভাত খাইয়া দূর দূরতর স্থান হইতে আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ দিবার সুবিধা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে কাহাকে অতি প্রত্যূষে, কাহাকে ৫।৬টার সময়, কাহাকে কাহাকে বা ৮টার সময় আহার করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহির হইতে হয়। আহারান্তে বিশ্রাম করা চলে না। "জীর্ণান্ন এব ভুঞ্জীত" অর্থাৎ আহার সুজীর্ণ হইলে ভোজন করিবে, এ বিধি পালন করা ঘটে না; "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ" অর্থাৎ আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিবে এ ব্যবস্থাও লঙ্ঘন করিতে হয়। বিধি লঙ্ঘনের কুফলও হাতে হাতে ফলিতেছে; অধুনা বহুলোকে অধ্যশনে রত রহিয়া, অজীর্ণে ভোজন করিয়া এবং আহারান্তে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে না পাইয়া গ্রহণী, অজীর্ণ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাদের সন্তানগণও দুর্ব্বল কোষ্ঠ লইয়া ভূমিষ্ট হইতেছে।

অতঃপর আহার প্রভৃতির কথা। জীবন ধারণের জন্য পুষ্টিকর তুষ্টিবর্দ্ধন পরিমিত আহারের প্রয়োজন, স্নানপানাবগাহনের জন্য নির্ম্মল জলের আবশ্যক এবং সর্ব্বোপরি বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন। বাসগৃহ এবং পরিচ্ছদ প্রভৃতি শরীর রক্ষণোপযোগী আরও কত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এ যুগে প্রয়োজনের অনুরূপ দ্রব্য সুলভ নহে। সত্য বটে ভারতভূমি রত্ন-প্রসবিনী, ভারতের লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা এখানেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে সুতরাং অক্রেয় হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য এ দেশের বহু লোককে না খাইয়া, অল্প খাইয়া, কদন্ন খাইয়া দিন কাটাইতে হয়। অনাহার অল্পাহার এবং কদর্য্যাহার—স্বাস্থ্যভ্রংশের হেতু, তাই আমরা দিন দিন বল-বর্ণ-বীর্য্যভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছি।

যে সময়ে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশীয় বণিক সকল সুভাগমন করেন নাই, তখন এ দেশের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। দেশে যাহা জন্মিত তাহাই দেশের লোকের ভোগে আসিত, অজন্মার বৎসরও কষ্টে সৃষ্টে কাটিয়া যাইত; কদাচিৎ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত। এখন লোকের ঘরে সঞ্চিত শস্য রহে না রাখিবার উপায় নাই। দেশ কুড়াইয়া, চতুর্গুণ মূল্যে ক্রয় করিয়া, বিদেশীয় বণিকেরা দেশ দেশান্তরে লইয়া

যায়। একবার শস্য জন্মিবার ত্রুটী হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অল্পাহার ত আমাদের সঙ্গের সাথী।

এ দিকে খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতা দেখিয়া শঠ বণিকেরা সময় পাইয়াছে। তাহারা দেশের কল্যাণের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ধর্ম্মের মাথা খাইয়া আপন আপন উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। তৈলিকেরা সর্ষপের সঙ্গে নানা প্রকার তৈল-যোনি ফল শস্য ভেজাল দিয়া ঘানি যন্ত্রে নিষ্পেষণ করত অতি কদর্য্য হুঙ্কার জনক তৈল বাহির করে, অগত্যা সেই তৈল আমাদিগকে মাখিতে, খাইতে এবং ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করিতে হয়। অধুনা গোহত্যার প্রাবল্যে এবং দেশে ভাল ষাঁড় না থাকাতে গোজাতি হীন ও ক্ষীণ হইতেছে, দেশে সেকালের ন্যায় প্রচুর দুগ্ধ উৎপন্ন হয় না। তারপর বণিক্ শাঠ্যের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব। নির্জ্জল দুগ্ধ দেশে দুর্লভ হইয়াছে, বিশুদ্ধ ঘৃত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। দুগ্ধ ব্যবসায়ী দুধে জল মিশাইয়া বিক্রয় করে, অতি কদর্য্য জীবাণু সমাকুল জল মিশাইতেও ইতস্ততঃ করে না। ঘৃত ব্যবসায়ীদিগের আচরণ আরও ভয়াবহ ও ঘৃণার্হ। চর্ব্বী ও বাদামের তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য ভেজাল দিয়া ঘৃত ব্যবসায়ীরা ঘৃতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সদ্যোহত গো-মেষাদির চর্ব্বী অনার্য্যদিগের খাদ্য প্রস্তুতার্থে ব্যবহৃত হয় সুতরাং তাহা মূল্যবান্ সুতরাং সেরূপ চর্ব্বী ভেজাল দিলে লাভ হয় না। তজ্জন্য তাহারা রোগে মৃত গো-শূকর মেষ মহিষ এবং ঘোড়া প্রভৃতির চর্ব্বী প্রক্রিয়া বিশেষে ঘৃতের সঙ্গে ভেজাল দিয়া বিক্রয় করে। আরও কত দ্রব্যে কত ভেজাল চলিতেছে তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ দুষ্কর্ম্ম পূর্ব্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল না, যুগ মাহাত্ম্যে ঘটিয়াছে। ভেজাল দেওয়া খাদ্য খাইয়া আমরা স্বাস্থ্য ভ্রষ্ট হইতেছি।

পূর্ব্বে এ দেশে, দেশের লোকের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধান্য-গম-যব প্রভৃতি শূক ধান্য, মুগ মসুর প্রভৃতি শমী ধান্য গোলায় মজুত রহিত, কদাচিৎ বিদেশে যাইত। তখন গোহাল ভরা হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী ছিল, গ্রামে গ্রামে মাঠে ঘাটে প্রকাণ্ড বৃষ বিচরণ করিত। দেশে দধি দুগ্ধ ঘৃত সর নবনীতের অভাব ছিল না। ইংরেজ প্রবর্ত্তিত যুগে, গো খাদকের অত্যাচারে অবাধ বাণিজ্যের প্রভাবে আমরা সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছি।

পৌরাণিক হিন্দুর রাজ্যে কি ছিল কি না ছিল তাহা নির্ণয় করা সুসাধ্য নহে; ঐতিহাসিক হিন্দুর রাজ্যে গোহত্যা ছিল না। মুসলমান এ দেশে আসিয়া গোহত্যা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইংরেজেরা এ দেশীয়দিগকে যেরূপ অধঃপাতে দিয়াছে, মুসলমানেরা সেরূপ দেয় নাই বা দিতে পারে নাই। মুসলমানের আমলে

হিন্দুগণের মনুষ্যোচিত সবাই ছিল। বাহুতে বল ছিল হৃদয়ে দুর্জ্জয় সাহস ছিল, হাতে অস্ত্র শস্ত্র ছিল, আর আপন আপন দেশে সকলেরই জন্মস্বত্ব বজায় ছিল। সুতরাং মুসলমানেরা যেখানে সেখানে গোহত্যা করিতে সাহসী হইতেন না। তারপর মুসলমানেরা এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশের ধনে তাহাদের দরদ জন্মিয়াছিল, গোধন বধে তাঁহারা ধর্ম্মহানি মনে না করিলেও ধন হানি মনে করিতেন সুতরাং উদর পোষণের জন্য গোহত্যা অতি অল্পই হইত। ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের অধুষিত ক্ষেত্র নহে, খাইতে আর লইতে তাঁহারা আসিয়াছেন। মেরে কেটে খাওয়া, আর ছলে, বলে ও কৌশলে লইয়া যাওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ বহু লোকের কর্ম্ম ভূমি। বাণিজ্য অবাধ সুতরাং ইংরেজ, ফরাসি, জার্ম্মান্, দিনেমার, এবং ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিক্‌গণ; আরব, পারস্য, মিসর, তুরস্ক, কাবুল এবং কান্দাহার প্রভৃতি দেশের মুসলমান সম্প্রদায়, চীন জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি-ব্যক্তিগণ, আরও কত দেশের কত শত লোক এ দেশে আসিয়া বেচা কেনা করিতেছে, কল কারখানা স্থাপন করিয়া নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে, রেল, ট্রাম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতেছে। তদুপলক্ষে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী নানা দিক্‌দেশ হইতে আসিয়া নানা প্রকার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা বিদেশ হইতে আসে, তাহাদের মধ্যে কেহই এক মুষ্টি আহার্য্য দেশ হইতে সঙ্গে লইয়া আসে না, ভারত ভূমিকে সকলের আহার যোগাইতে হয়। তজ্জন্য, বাণিজ্যার্থ যাহা বিদেশে প্রেরিত হয় না, সেরূপ খাদ্যও এ দেশে দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মাছ, মাংস, ফল, মূল, তরি তরকারি এবং শাক সবজির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ভারতবাসীর এবং ভারত-প্রবাসী লোকদিগের আহার্য্য উৎপাদন করা ভারতভূমির দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

দেশে বহু লোক সমাগমের বাধা দিবার আমরা কেহ নহি। বহু দেশের লোকে তাহা পারে, আমরা পারি না। ট্রান্‌স্‌ভাল প্রভৃতি দেশে এসিয়া বাসীরা খাটিয়া খাইবারও স্থান পাইতেছে না। এ দেশ আমাদের নহে ইংরেজের। ইংরেজ অবাধ বাণিজ্যের বাধা দিতে পারেন না। তাঁহাদের সকলেরই দেশে বাণিজ্যো-পলক্ষে না গেলে চলে না, এখানে বাধা দিলে সেখানেও বাধা পাইতে হয়। তাহাতে বিলক্ষণ স্বার্থের হানি আছে। তাই স্বার্থপর ইংরেজ এ দেশে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্ত্তক।

ক্রমশঃ

সম্পাদক।

মুষ্টিযোগে প্লীহা যকৃৎ চিকিৎসা।

প্লীহা, যকৃতে কন্‌জেস্‌সন বা রক্তাধিক্য হইয়া সামান্য প্রদাহ হইলে।

১। এক খণ্ড পাতলা নেকড়া তার্পিন তৈলে ভিজাইয়া এরূপভাবে নিংড়াইয়া লইবে যেন ঐ নেকড়াস্থিত তার্পিন অন্য কোন স্থানে চুঁয়াইয়া না যায়। তৎপর গরম জল দ্বারা প্লীহা বা যকৃৎ স্থান বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া তদুপরি তার্পিন মিশ্র নেকড়া খণ্ড বেশ করিয়া বসাইয়া দিবে যেন কোন স্থান শূন্য না থাকে। তৎপর ঐ নেকড়াখণ্ডের উপর কোমল কদলী পাতা স্থাপন করিয়া সুন্দররূপে কাপড় জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কিছুকাল পর জ্বালা আরম্ভ হইলে নেকড়া খুলিয়া ফেলিবে ইহাতে সামান্য প্রদাহ দূর হয়।

২। গোমূত্র উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে ফ্লানেল ভিজাইয়া স্বেদ দেওয়ার উপকার সর্ব্বজন সম্মত।

৩। কয়েকটী রশুনের ছাল ফেলাইয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহযোগে বাটীয়া প্লীহা যকৃতে দিন ২।৩ বার প্রলেপ দিলে বেশ উপকার হয়।

প্লীহা যকৃতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক গুরুতর প্রদাহ হইলে।

১। রক্ত বা শ্বেত চিতার শিকড় বেশ করিয়া বাটিয়া, রুটী বা প্লীহা যকৃতের প্রদাহের স্থানাকারে, প্রদাহান্বিত স্থানের উপর লাগাইয়া তদুপরি একখানা নেকড়ার দুই এক ভাঁজ স্থাপন করিবে। এবং ঐ স্থানে অনবরত এমন ভাবে জল ধারা দিবে যেন ঐ প্রলেপ নেকড়ার নীচে বেশ ভিজা থাকে, শুকাইয়া না যায় এ প্রণালীতে দুই এক ঘণ্টা পর এলোপ্যাথিক ঔষধ, লাইকারলিটী বা রেড আইওডাইড মার্কারীর মলম বা তীব্র লিনিমেণ্ট অব আইওডিনের বাহ্যিক ব্যবহারের ন্যায় ফোস্কা উঠিবে। এই ফোস্কা দুই এক দিন রাখিয়া জল নিঃসারণ করিয়া দিবে। ইহাতে অবরুদ্ধ প্রদাহ স্থানের রস: রক্ত সরিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার লাঘব হইবে।

২। বরুণ বা বৈন্নার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বেশ উপকার হয়।

৩। বন আদা, সজিনার ছাল, রাই সরিষা, গোলমরিচ বাটিয়া প্রলেপ দিলেও প্রদাহ শান্তি হয়।

৪। তিল, তিসি, এরণ্ডবীজ, শ্বেত সর্ষপ বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

প্লীহা যকৃৎ স্বস্থান ছাড়িয়া বর্দ্ধিত হইলে।

১। রাজ হাঁসের বিষ্ঠা, পুরাতন দালানের চুণা, হরিতাল, দগ্ধ শঙ্খ চূর্ণ, বামন-হাটীর মূল জামীরের রসে বাটিয়া প্রতি দিন ২।৩ বার প্রলেপ দিলে প্লীহা যকৃতের বিবর্দ্ধন নষ্ট হয়।

২। বিষ কাটালীর কুশী, বরুণ অর্থাৎ বৈন্নার কুশী, দোক্তা তামাক পাতা, কলিচুণ, সজিনার ছাল, সাচি চিনি সমভাগ। পাতইসিজের পাতা অগ্নিতে সেকিয়া তাহার রসের সহিত প্রাগুক্ত দ্রব্যনিচয় বাটিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে অত্যন্ত দৃঢ় প্লীহা যকৃৎ প্রশমিত হয়।

৩। এক খণ্ড লেবু কাটিয়া তদ্দ্বারা দিনে ৫।৭ বার বিবর্দ্ধিত প্লীহা যকৃতের উপর ঘর্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। সির্কা ৵০ ছটাক, হিং ১ তোলা, হরিতাল চূর্ণ ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ॥০ তোলা একত্র করিয়া মালিশরূপে ব্যবহার্য্য।

৫। দগ্ধ কাঁচা তেঁতুলের শাঁস, সৈন্ধব লবণ, খাঁটি সরিষার তৈল, কেচলা ঘাসের মোথার রস একত্র করিয়া মালিসরূপে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। হরিদ্রা চূর্ণ, বটের আঠা, ভুঁইচাঁপা ফুলের মূল, ঘুঘু পক্ষীর ডিম্বের শ্বেতাংশ একত্র বাটিয়া দিনে ৩।৪ বার প্রলেপ।

৭। পুঁইপাতার উপর পিঠে কলি চুণ ও সাচি চিনি মাখাইয়া ২।৩ তর প্লীহা বা যকৃতের উপর স্থাপন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বিবর্দ্ধিত প্লীহা, যকৃৎ নষ্ট হয়।

প্লীহা যকৃতাশ্রিত জ্বর—যে জ্বর অষ্ট-প্রহর লাগিয়া থাকে।

১। শামুকের কপাট ভস্ম ৩ রতি, লেবুর রস ১ তোলা চিনী বা পুরাতন গুড় সহ দিনে ৩ বার ব্যবহার করিলে সত্বর জ্বর ভাল হয়।

যে জ্বরের সহিত সতত সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে।

২। দণ্ড কলস বা ঘলঘসের মূল চূর্ণ ১ তোলা গোল মরিচ বা পিপুলের চূর্ণ।০ আনী একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণে দিনে ৩ বার সেব্য। ইহাতে সর্দ্দির দোষ নষ্ট হয়।

যে জ্বরের সহিত আমাশয় বর্ত্তমান থাকে।

৩। ভাদাইলার মোথা, আমলকী, আদা সমান ভাগ, তিন ভাগ হরিতকী, ৪ ভাগ শুঁঠ একত্র মিশাইয়া দিনে ৩ রতি পরিমাণে সেব্য।—ইহা অজীর্ণ ও অতিসারেও প্রয়োজ্য।

আমাশয়ের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকিলে।

৪। ডালিমের কুশী ৭টা সৈয়াদি পিয়ারার (কাটিলে যাহার মধ্যে লাল রং দেখা যায়) কুশী ৭টা, জামের কুশী ৭টা, সেঁচি শাকের ডগা ৭টা, মিঠা আমের কুশী ৭টা, কিঞ্চিৎ আদা একত্র সুন্দররূপে পিষিয়া ২৷৷০ তোলা ক্ষুদে মানফলের সহিত মিলাইয়া সাচি চিনি সহ সেব্য। দিনে ৩ বার রক্তামাশয়ের মহৌষধ।

প্লীহা ও যকৃতে শোথ ও জ্বর থাকিলে।

৫। বিচা কলার বাকল ভস্ম ১ তোলা, কাঁঠালের বূঁদী ভস্ম ১ তোলা, শুষ্ক মূলা ভস্ম ১ তোলা, চিতার মূল ১ তোলা, সোরা ১ তোলা, যবাক্ষার ১ তোলা। রশুনের রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটী। অনুপান চূণের জল।

৬। শোথ স্থানে খেজুরের শিকড় অথবা কৃষ্ণ ধুতুরার শিকড় কিম্বা পুনর্নবার মূল বাঁধিয়া দিবে।

প্লীহা যকৃতের সহিত কামলা।

১। শ্বেত চিতার মূল পিষিয়া দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে তাহা স্থাপনান্তে উপরে নেকড়া রাখিয়া জল দ্বারা ভিজা রাখিলে একটী ফোস্কা পড়িবে ঘা হওয়া মাত্র কামলা প্রশমিত হইবে।

২। অড়হরের পাতা অথবা মিঠা আমের ছাল, হলুদ, চূণ একত্রে হস্তের তালু ও পদতলে বারম্বার ঘর্ষণ করিলে সত্বর কামলা দূর হয়।

প্লীহা যকৃতের সহিত রাত্র্যন্ধতা।

১। একটী ছাগের যকৃৎ ঘৃত বা তৈলে ভাজিয়া প্রথম গ্রাস অন্নের সহিত ক্রমাগত ৩ দিবস সেবন করিলে আশ্চর্য্যরূপে রাতকাণা বিদূরিত হয়।

প্লীহা যকৃতের সহিত মুখে ঘা।

১। লবণ জলের কুলী বিশেষ উপকারক।

২। সোহাগার খৈ, সোঁদালের পাতা, ক্ষুদে মানকনের পাতা দিনে ৩।৪ বার চিবাইলে বিশেষ উপকার হয়।

৩। দেশীয় সঙ্কোচক কুল্ল্য বিশেষ উপকারক।

প্লীহা যকৃতে দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তস্রাব।

১। বিশল্যকরণীর পাতা চিবাইলে অবিলম্বে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

২। কামিনী ফুলের পাতা চিবাইলে আশ্চর্য্য উপকার হয়।

মুখে মামুরকী ক্ষতের তন্য।

১। ক্ষতের চতুষ্পার্শে স্ফীত স্থান বাদ দিয়া সুস্থ স্থানে চোল্‌তা পাতা ঘসিয়া দিবে। এরূপ ভাবে লাগাইবে যেন অসুস্থ স্থানের বাহিরে গোলাকার রেখা হয়।

২। মাখন ৵০ ছটাক অগ্নিতে চড়াইয়া নিস্ফেন হইলে তাহাতে গাঁজার পাতা বাটীয়া গুটী করিয়া তাহা ফেলাইয়া দিবে। পরে ভাজা ভাজা হইলে মাখনের ঘৃত ছাকিয়া লইবে। এই ঘৃতের সহিত কাচা চূণ ৫ এক কাঁচ্চা, পিয়াজের রস ১০ ছটাক ক্ষুদে মানকলের পাতার রস ১০ ছটাক, সোন্দালের পাতার রস ১০ ছটাক, মিলাইয়া পুনরায় জ্বালে চড়াইবে। জল নিঃশেষিত হইলে এই ঘৃত নেকড়ায় মাখাইয়া গালের উপরিভাগে স্থাপন করিবে। ভিতরে ক্ষত থাকিলে তুলায় ঘৃত ভিজাইয়া ক্ষতের উপরি লাগাইয়া দিবে। লেবু সিদ্ধ জল দিয়া উত্তপ্তাবস্থায় ক্ষত পরিষ্কার করিতে হইবে।

দাঁতের গোড়া স্ফিত হইলে।

১। পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, আদা একত্র করিয়া রাত্রি দিন ৫।৬ বার চিবাইয়া আকণ্ঠ পর্য্যন্ত কবল ধারণ করিবে। ইহাতে সত্বর লালাস্রাব হইয়া বেদনা ও ফুলা নিবারিত হইবে।

প্লীহা ও যকৃতের নিরক্তাবস্থায় সবিরাম বা ঘুষঘুষে জ্বর ও দুর্ব্বলতায়।

১। আতৈস্, নিম্বমূলের ছাল, ছাতিয়ানমূলের ছাল, রেউ চিনি, কাবাব চিনি, কলম্বা, শুঁঠ, নাটাবীজ চূর্ণ, পিপুল, হিরাকস, জঙ্গী হরিতকী, জাফ্রাণ, কটকী, মরিচ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। কোষ্ঠ তারল্য বা কাঠিন্য বিবেচনায় কটকীর হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। প্রাগুক্ত চূর্ণের পূর্ণ মাত্রা ।০ সিকি। পুরাতন গুড়ের সহিত

সংমিশ্রণান্তে জল সহ দিবায় ৩ বার সেব্য। সকালবেলা ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পুরাতন চাউলের অন্ন এবং চূণের জল সংমিশ্রিত দুগ্ধ। বৈকালে পরিপাকের অবস্থানুযায়ী দুগ্ধ রুটী বা দুগ্ধ সাগু।

প্লীহা ও যকৃতে কয়েকটী ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ মহৌষধ।

১। নিশাদল ২ তোলা, তুঁতে ২ তোলা, সোরা ২ তোলা, যবক্ষার ২ তোলা, রক্তজারণ ২ তোলা, সৈন্ধব ৵০ ছটাক। একটী মৃণ্ময় হাঁড়িতে প্রাগুক্ত দ্রব্য নিচয় রাখিয়া জাল দিতে থাকিবে। যখন জিনিষগুলি পোড়া পোড়া হইবে তখন নামাইয়া বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া ⁄।০ পোয়া শীতল জলে নিক্ষেপ করত দ্রব করিয়া রাখিবে। এই ঔষধ ১—৫ ফোঁটা শীতল জলের সহিত (পরিমাণ ৵০ ছটাক) প্রাতঃকালে শূন্যোদরে সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। ইহার প্লীহা যকৃৎ নাশক শক্তি অমোঘ।

২। আকন্দ পত্র ১০৮ টা, যইন ⁄০ ছটাক, সৈন্ধব ⁄০ ছটাক, দধির মাত ⁄১৷৷০ সের। আকন্দ পত্র ও সৈন্ধব লবণ একত্র করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। পরে আকন্দ পত্র ভস্ম ও সৈন্ধব লবণ, যইন ইহাদিগকে দধির মাতের সহিত মিলাইয়া যাবত জল থাকিবে তাবৎ পর্য্যন্ত জাল দিবে। এই মিশ্র পদার্থ প্রতি দিন।০ সিকি পরিমাণে শীতল জল সহ সেব্য।

৩। যবক্ষার ১ ভাগ্তীর ডগা ৭ লোহা চূর্ণ ১ ভাগ। কুল পরিমাণ বটী বানাইয়া শীতল জল সহ দিনে ৩ বার সেব্য।

৪। সোহাগা ⁄০ ছটাক, হরিদ্রা ⁄০ ছটাক, সাজিমাটী ⁄০ ছটাক, লবণ ⁄০ ছটাক, ঘৃতকুমারির শাঁসে মর্দ্দন করিয়া ৭ দিন সেব্য।

৫। তুঁতে, সোহাগা, সোরা, যবাক্ষর, মুদ্রাশঙ্খ, গন্ধক, ভেলার কস, বিষ কচু সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ইহার ⁄০ আনি মাত্রায় শীতল জল সহ প্রাতঃকালে সেব্য।

৬। গোলমরিচ ১ তোলা, উচ্ছেপাতা ১ তোলা, হিরার কস।০ সিকি প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় ডাবরি প্রমাণ শীতল জল সহ সেব্য।

৭। কটকী ১ তোলা, নাটাগোটা ১৫ টা, কুচিলা।০ শিকি, রশুন ১ তোলা, ইন্দ্রযব ১ তোলা, যইন ১ তোলা, বাখারী চূণ ১ তোলা। সমস্ত বাটিয়া ⁄১ সের পরিমিত কালা গরুর চোণায় জাল দিয়া ⁄।০ পোয়া অবশেষ নামাইয়া শীতল জল সহ শূন্যোদরে ১ তোলা মাত্রায় সেব্য।

৮। পিপুল, মরিচ, শুঁঠ, কুমরের ডাটা ভস্ম, শিমুল ছাল, তেঁতুলের ছ.লভস্ম, সেজ্ঞার পাতা, আকন পাতা, বিচাকলার বাকল ভস্ম প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। লবণ ⁄।০ সের গরুর চোণা ⁄১।০ সের। উপরোক্ত ঔষধগুলির চূর্ণ এবং লবণ ও চোণা একত্র করিয়া জাল দিয়া গুড়বৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা, শীতল জল সহ সেব্য।

৯। নেবুর রস ⁄০ ছটাক, মানকচুর শাথার শাস ১ তোলা একত্র বাটিয়া কলাপাতার চুঙ্গীতে ভরিয়া গলার ভিতরে ঢালিয়া দিবে। ইহাতে কাহারও বা বমি কাহারও বা দাস্ত হইয়া এক দিনে প্লীহা আরোগ্য হয়। দাস্ত হইয়া আমের মত দেখা দিলে যে কোন প্রকার শৈত্য ক্রিয়া করিবে।

১০। মরিচ, পিপুল, সোহাগা, হিং, পুনর্নবা, দাঁতথড়কা, বাসক, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতা, সৈন্ধব, এবং হিরাকস প্রত্যেক সমভাগ। এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া ⁄২৷৷০ গাই গরুর চোণায় জাল দিয়া গুড়বৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান অপামার্গ পুড়িয়া জলে ফেলিয়া সেই জল।

শিশুর প্লীহা যকৃতে।

১। আদার রস ও ছাগ দুগ্ধ সমভাগে মিলাইয়া দিনে ৩ বার সেব্য।

শাস্ত্রোক্ত কতিপয় মুষ্টিযোগ।

১। পুরাতন গুড় ও হরীতকী চূর্ণ অথবা বিটলবণ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে গরম জলের সহিত সেবনে প্লীহা যকৃৎ নষ্ট হয়।

২। ২।৩টী পিপুল জল অথবা পুরাতন গুড় সহ সেবন করিলে উপকার হয়।

৩। তাল জটা ভস্ম পুরাতন গুড় সহ সেব্য।

৪। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, যবাক্ষার, সৈন্ধবলবণ সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া লেবুর রসে মাড়িয়া ৵০—।০ আনা মাত্রায় সেব্য।

৫। যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল, দন্তী, সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৷৷০ তোলা মাত্রায় উষ্ণজল দধির মাত, মুরা বা আসব সহ সেব্য।

৬। চিতামূল পেষণ করিয়া ১ রতি বটী বানাইবে। ঐ বটিকা ৩টী, পাকা কলার ভিতর ভরিয়া থাইবে।

৭। হরীতকী, আদা, চিরতা, সমপরিমাণ প্রাতঃকালে সেব্য।

৮। চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দ পত্র অথবা ধাইফুল চূর্ণ পুরাতন গুড় সহ সেব্য।

৯। রসুন, পিপুল মূল, হরীতকী ভক্ষণ। গো মূত্র, পান বিশেষ উপকারক।

১০। শরপুঙ্খা বা বননীল বাটিয়া ॥০ তোলা মাত্রায়, ঘোল সহ সেব্য।

১১। শঙ্খনাভি চূর্ণ ॥০ তোলা গোঁড়া লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে কূর্ম্ম সমান প্লীহা নষ্ট পায়।

১২। সমুদ্র ঝিনুক ভস্ম প্লীহা নাশক।

১৩। দেবদারু, সৈন্ধবলবণ ও গন্ধক সমভাগে ভস্ম করিয়া সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ অগ্রমাংস নষ্ট হয়।

১৪। রোহিতক অর্থাৎ রয়না ও হরীতকী ক্বাথ সহ পিপুল চূর্ণ ৶০ আনী মিশাইয়া সেব্য।

১৫। কেয়া গাছের পাতার ক্ষার পুরাতন গুড় সহ সেব্য।

১৬। পেঁপের আঠা ।৵০ আনী চিনি ।৵০ আনী এক বটী। দিনে ৩ বার সেব্য।

১৭। সজিনার ক্বাথে, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান।

১৮। রয়না ও হরীতকী ক্বাথে পিপুল চূর্ণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহা, যকৃৎ নষ্ট হয়।

১৯। নাটা বীজের শাস, ভাণ্ডীর ডগা প্রাতঃকালে সেব্য।

২০। রোহিতক ছাল, যবাক্ষার, চিরতা, কটকী, মুতা, নিশাদল, আতইচ ও শুঁট প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা ৵০—৶০ আনা, শীতল জল সহ সেব্য।

শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী।
বন্দ্য কাওয়াল জানী—টাঙ্গাইল।

বিসূচিকা চিকিৎসা।

(হোমিওপ্যাথিক মতে)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্রতিক্রিয়াবস্থা।

REACTION.

তৃতীয়াবস্থার শেষে রোগীর মৃত্যু অথবা পুনর্জীবনী ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তৃতীয় বা চরম অবস্থার শেষ সময়ে যখন রোগী সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত হয় এবং মৃতের ন্যায় ১ ঘণ্টা বা ১॥০ ঘণ্টা কাল স্থির থাকে, তৎপরে হয় রোগীর পুনর্ব্বার জীবনী শক্তির কার্য্য আরম্ভ হয়; না হয় মৃত্যু হইয়া থাকে। যে রোগীর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহার প্রথমতঃ লুপ্তপ্রায়ঃ নাড়ী মণিবন্ধে (wrist) মৃদু মৃদু অনুভূত হয়; ইহাই প্রতিক্রিয়ার প্রথম লক্ষণ। এবং ক্রমশঃ আবার ভেদ ও বমন আরম্ভ হয়। যদি যথার্থ প্রতি ক্রিয়া আরম্ভ হয় অর্থাৎ রোগী বাঁচিবার পথে আইসে, তাহা হইলে এই প্রতিক্রিয়ার সামান্য ভেদ ও বমন শীঘ্রই হ্রাস হইয়া, ক্রমশঃ জীবনী শক্তির কার্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলেই যে রোগীর জীবনের আশা সম্পূর্ণ হইল এমত নহে; যে অবধি না রোগীর প্রস্রাব আরম্ভ হয় এবং মল পিত্তযুক্ত হয় সে পর্য্যন্ত রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। ইহাকে সুস্থ প্রতিক্রিয়া বলা যায়; এই সুস্থ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে রোগীর শরীর ক্রমশঃ স্বাভাবিক উষ্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, অল্প অল্প করিয়া মূত্র আরম্ভ এবং মল ক্রমশঃ ঘণীভূত হয়। এক্ষণে রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হয়, কিন্তু প্রতিক্রিয়াবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। শরীরের বর্ণের নীলিমা অপগত হইয়া স্বাভাবিক বর্ণে পরিণত হয়। চক্ষুর জ্যোতিঃ ক্রমশঃ পুনরাগত হইতে থাকে; অল্প অল্প করিয়া রোগী শরীরে বল পাইতে থাকে এবং রোগী আপনাকে বেশ সুস্থ বোধ করে। আর যে সকল রোগীর সামান্য প্রতিক্রিয়া আরব্ধ হইয়াই নানা উপসর্গ প্রকাশ পায় তাহার জীবনের আশা বড়ই অল্প। ইহাকে প্রতিক্রিয়া না বলিয়া রোগের পুনরাক্রমণ বলিতেও পারা যায়। এই অবস্থায় রোগীর মূত্র বন্ধ থাকার জন্য পেট ফুলিয়া যায়, কোন কোন রোগীর দ্বিতীয়াবস্থার ন্যায় আবার চাল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হইতে থাকে এবং আনুসঙ্গিক বমনও হয়। ফলতঃ যদি এরূপ অবস্থা শীঘ্রই না উপশম হয়, তাহা হইলে রোগীর

জীবনের আর কোন আশাই থাকে না। অনেক স্থলে রোগীর উদরে সূত্র কৃমি থাকার জন্যই এরূপ পুনরাক্রমণ হইতে দেখা যায়। অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াবস্থায় রোগের পুনরাক্রমণ (relaps) হইলে কয়েকটী উপসর্গ প্রকাশ পায়; যথা মূত্র রোধ হওয়া নিবন্ধন, পেট ফাঁপা মূত্র রোধ হেতু বিকার, বমন এবং হিক্কা কর্ণমূল ফুলা, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ; অঙ্গের গ্রন্থের আক্ষেপ (টানিয়া ধরা) ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায় এই উপসর্গ গুলি শীঘ্র উপশমিত না হইলে ইহা দ্বারা রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উদরে সূত্র কৃমি থাকিলে প্রায়ই প্রতিক্রিয়াবস্থায় আবার অধিক পরিমাণে ভেদ বমন আরম্ভ হয়। প্রতিক্রিয়াবস্থায় যে বিকার উপস্থিত হইতে দেখা যায় অধিকক্ষণ মূত্র রোধ থাকার জন্য মূত্রের ইউরিয়া (uria) বহির্গত হইতে পায় না সুতরাং উক্ত বিষাক্ত পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত বিষাক্ত করে এবং ইহাই ওলাউঠার প্রতিক্রিয়াবস্থার বিকারের একটি প্রধান কারণ হইয়া উঠে। ইহাতে প্রবল জ্বর প্রকাশ পায়, জিহ্বা শুষ্ক হইয়া যায় অত্যন্ত গাত্র দাহে রোগী শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, প্রবল পিপাসা, শিরোভার শিরঃপীড়া ও রোগী ভুল বকিতে থাকে, নাড়ী ক্ষীণ অথবা অনুভূত হয় না। কোন কোন রোগীর ইহার আনুসঙ্গিক উদরাময় হইয়া থাকে, ফুসফুস প্রদাহ জনিত পার্শ্ব বেদনা হইয়া থাকে, দন্তের মাড়ি হইতে রক্ত বহির্গত হয়;—এই অবস্থায় প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে; তবে উপদ্রব বিহীন মূত্র রোধ জনিত সামান্য বিকার লক্ষণে দুই একটী রোগীর আরোগ্যও হইয়া থাকে।

ওলাউঠার আবশ্যকীয় ঔষধ সকল।

ডাক্তার রুবিণীর স্পিরিট ক্যাম্ফার।

ইটালি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রুবিণী সাহেব শুদ্ধ এই স্পিরিট ক্যাম্ফর দ্বারাই ওলাউঠার রোগীর চিকিৎসা করিতেন। তাহার মতে ইহা ওলাউঠার সকল সময়ের এবং সকল অবস্থারই উপযুক্ত ঔষধ। অধিকন্তু তিনি ইহাও বলিতেন যে ওলাউঠা রোগের চিকিৎসায় স্পিরিট ক্যাম্ফর ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ আবশ্যক হয় না। কিন্তু অন্যান্য ডাক্তার গণের মতে স্পিরিট ক্যাম্ফর যে ওলাউঠার সদৃশ লক্ষণ মত এরূপ নহে। প্রকৃত ওলাউঠা রোগে রোগীর যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় শুদ্ধ ক্যাম্ফর দ্বারাই যে সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ বলা যায় না। এবং

অপর একটী বালক ১২।১৩ বৎসর বয়স ১২০ গ্রেণ শুষ্ক কর্পূর খাইয়াছিল। এবং ৫।৭ মিনিটের মধ্যে অচেতন হইয়া যায়। অল্পক্ষণ পরে খেঁচুনি আরম্ভ হয়। এবং ধনুস্তম্ভের ন্যায় মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়। সর্ব্ব শরীর শক্ত হইয়াছিল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইলে খেঁচুনি বৃদ্ধি পাইল ও মস্তক হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ধূম্রবর্ণ হইয়াছিল, নাড়ী নিস্তেজ ও অবশেষে লোপ পাইয়াছিল। অতঃপর তাহাকে ঠিক মৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ অল্পক্ষণ থাকিয়া, আবার মৃদু নাড়ীর গতি অনুভূত হইল এবং আবার খেচুনি আরম্ভ হইল। অবশেষে উহার মুখ দিয়া ফেনার মত নির্গত হইতে লাগিল; ইহার পর রোগীকে বরফ মিশ্রিত জল দেওয়াতে, রোগী বমন করিতে আরম্ভ করিল ৩।৪ বার বমনের পর রোগী সুস্থ হইয়াছিল।

ডাক্তার হানিমান বলিয়াছেন, যে কর্পূর দ্বারা বিষাক্ত হইলে ঠিক কিরূপ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় তাহা স্থির করা অতীব কঠিন। কারণ সচরাচর কর্পূর সেবনে দুই প্রকার লক্ষণ দেখা যায় যথা—প্রথমে উত্তেজনা ও পরে অবসাদ সুতরাং কর্পূর উত্তেজক কি অবসাদক ইহা স্থির করা সহজ নহে যদিও কর্পূরের ঠিক ক্রিয়া কি ইহা মহাত্মা হানিমান উল্লেখ করেন নাই তথাপি কর্পূর যে ওলাউঠা রোগের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ঔষধ ইহা তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এবং কর্পূরারিষ্ট অর্থাৎ টিংচার ক্যাম্ফরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি (ডাক্তার হানিমান) বলেন ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় রোগীকে প্রথমে টিংচার ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে হোমিওপ্যাথিক মতে ক্যাম্ফর যখন প্রায় সকল ঔষধেরই প্রতিসেধক (antidote) তখন প্রথমে ক্যাম্ফর প্রয়োগের পর অন্যান্য ঔষধে কার্য্য হইতে পারে কি না? এরূপ অনেক রোগী দেখা যায় যাহারা শুদ্ধ ক্যাম্ফর প্রয়োগেই সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়। অন্য ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না; এবং এই কারণে ইটালি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রুবিণী সাহেব শুদ্ধ ক্যাম্ফরই ওলাউঠার ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহার মতে অন্য ঔষধ ওলাউঠা চিকিৎসায় আবশ্যক হয় না। কিন্তু সকল রোগই যে ক্যাম্ফর প্রয়োগেই আরোগ্য হয় এরূপ নহে। অনেকগুলি ওলাউঠা এরূপ দেখা যায় যাহাতে ক্যাম্ফর কোনই আবশ্যক হয় না এবং ক্যাম্ফর প্রয়োগ করিলেও কোন উপকার হয় না। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে কতকগুলি ওলাউঠা রোগ ক্যাম্ফরের অধিকার ভুক্ত এবং কতকগুলি রোগ ক্যাম্ফরের অধিকার বহির্ভূত। এই কারণ বশতঃ ডাক্তার হানিমান বলিয়াছেন সকল ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় ক্যাম্ফর প্রয়োগ করিবে এবং

তাহাতে উপকার না হইলে কুপ্রম মেটেলিক, অথবা ভেরাট্রম পর্য্যায় ক্রমে প্রয়োগ করিবে। ডাক্তার হানিমান নিজ চক্ষে যে সকল ওলাউঠা রোগ দেখিয়াছিলেন তাহার এই রূপই ব্যবস্থা করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়া ছিলেন বলিয়াই তিনি ওলাউঠার চিকিৎসার এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ডাক্তারগণের মতের সহিত তাহার মতের কোনই ঐক্য দৃষ্ট হয় না। ডাক্তার হিউজ বলেন যে কর্পূর (Camphor) অল্প মাত্রায় সেবন করিলে উত্তেজক গুণ প্রকাশ পায়; কিন্তু অধিক মাত্রায় সেবন করিলে অবসাদক গুণ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার হেম্পল বলেন ক্যাম্ফর ওলাউঠার সদৃশ লক্ষণ যুক্ত ঔষধ নহে। ডাক্তার বেয়ার বলেন যে, সামান্য কলেরায় ইহা (ক্যাম্ফর) পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যাহাই হৌক ক্যাম্ফর সম্বন্ধে নানা রূপ মত ভেদ থাকিলেও ক্যাম্ফর যে কলেরা রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিৎ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বলিলেও বলা যাইতে পারে। কোন কোন ডাক্তার বলেন যে ক্যাম্ফর সকল রোগীকে প্রয়োগ আবশ্যক হয় না; যে রোগীর প্রথমাবস্থা ক্যাম্ফরের সদৃশ লক্ষণ অনুযায়ী উহাকে কেবল ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারাই ক্যাম্ফরের সদৃশ লক্ষণ কি ইহা ঠিক নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। মহাত্মা হানিমান হইতে এতাবৎকাল ক্যাম্ফর ওলাউঠা রোগে প্রধান রূপে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার সদৃশ লক্ষণ কেহই স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন ক্যাম্ফর অবসাদক; কেহ কেহ বলেন উত্তেজক; মহাত্মা হানিমান এই প্রশ্নের মীমাংশা এই রূপে করিয়াছেন যে অধিকাংশ ঔষধেরই দুইটী ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় একটী মুখ্য ক্রিয়া এবং একটী গৌণক্রিয়া গৌণক্রিয়া মুখ্য ক্রিয়ার বিপরীত দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই মুখ্য ও গৌণক্রিয়া হইতেই হোমিওপ্যাথিকের সৃষ্টি। এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া অনুসারে কার্য্য করেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ঔষধের গৌণ ক্রিয়ার উপর কার্য্য করেন। কিন্তু সকল ঔষধেই যে এরূপ মুখ্য ও গৌণ ক্রিয়া দেখা যায় এরূপ নহে। ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া দেখিতে হইলে উহা অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয় এবং গৌণ ক্রিয়া দেখিতে হইলে অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঔষধের মুখ্য ক্রিয়া ও গৌণ ক্রিয়ার যাহা প্রভেদ এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিকে তাহার প্রভেদ মাত্র। এলোপ্যাথিক মতে ঔষধের মুখ্য ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে ঠিক তাহারই বিপরীত গৌণ ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মুখ্য এবং

গৌণ ক্রিয়ার তারতম্য কি? মুখ্য ও গৌণ ক্রিয়ার তারতম্য এই যে মুখ্য ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং গৌণ ক্রিয়া স্থায়ী। এক্ষণে ক্যাম্ফরের কোন ক্রিয়ানুসারে হোমিওপ্যাথিক মতে ইহা ওলাউঠার প্রয়োগ উপযোগী তাহা দেখা উচিত। ক্যাম্ফরের মুখ্য ক্রিয়া উত্তেজক এবং গৌণ ক্রিয়া অবসাদক। এখানেও ক্যাম্ফরের গৌণ ক্রিয়া অনুসারে ওলাউঠার প্রথমাবস্থা এবং শেষাবস্থায় ইহার প্রয়োগ হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় রোগীর অবসাদ জন্মায় কিন্তু অধিক পরিমাণে ভেদ বা বমন আরম্ভ হয় না। ক্যাম্ফরের সদৃশ লক্ষণ অবসাদক কিন্তু ইহাতে ভেদ বা বমন অধিক পরিমাণে হয় না। অর্থাৎ সুস্থ শরীরে ক্যাম্ফর অধিক পরিমাণে সেবনে অধিক পরিমাণ ভেদ বা বমন হয় না; কোন কোন রোগীর সামান্য বমন হইতে পারে কিন্তু ওলাউঠার ন্যায় ভেদ হয় না;—ক্যাম্ফরে ওলাউঠা রোগের আক্রমণ অবস্থায় যেরূপ অবসাদ জন্মায় তাহাই প্রধানতঃ জন্মাইয়া থাকে সুতরাং ক্যাম্ফর ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিৎ কিন্তু ক্যাম্ফর প্রয়োগের পরও যদি চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন হইতে থাকে তাহা হইলে, আর ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা উচিৎ নহে। তখন লক্ষণানুসারে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ওলাউঠার শেষাবস্থায় যখন ভেদ ও বমন বন্ধ হয় এবং রোগী হিমাঙ্গ হয় নাড়ী লুপ্ত হয় তখন ও ক্যাম্ফর প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়।

ক্রমশঃ

ডাক্তার এস্, মুখার্জ্জি।

"আয়ুর্ব্বেদে পরলোকতত্ত্ব"।

আয়ুর্ব্বেদে পরলোকের কথা কেন? আয়ুর্ব্বেদ রোগের ও ঔষধের বিচার করিবে, দ্রব্যগুণ নির্ণয় করিবে, রোগাদির সাধ্যাসাধ্যের বিচার করিবে, রোগের নিদান স্থির করিবে, শারীরিক স্থান সকলের আলোচনা করিবে, আয়ুর্ব্বেদ শরীরিক রস রক্ত মাংসপেশী শিরাস্নায়ু প্রভৃতির ও বায়ু পিত্ত কফ এই দোষ ত্রয়ের বিচার ও স্থান নির্দ্দেশ করিবে, আয়ুর্ব্বেদ আপনার অধিকার ভুক্ত বিষয়ের অনুশীলনে মনোযোগী থাকিবে পরন্ত আয়ুর্ব্বেদে পরকালতত্ত্বের আলোচনা শুনিলে উহাকে

অনধিকার চর্চ্চা মনে করা যায়। ইহকাল ও এই দেহ লইয়াই আয়ুর্ব্বেদ প্রসঙ্গ সুতরাং পরকাল চিন্তা করা আয়ুর্ব্বেদের কি প্রয়োজন? আয়ুর্ব্বেদে পরকালতত্ত্বের প্রসঙ্গ শুনিয়াই লোকের মনে হটাৎ এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক ও হাকিমী প্রভৃতি যত প্রকার চিকিৎসা প্রণালী সভ্য সমাজে প্রচলিত আছে সম্ভবতঃ তন্মধ্যে কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানই একাল পর্য্যন্ত বিশেষরূপে পরকাল বিষয়িণী চিন্তায় বা আলোচনায় নিযুক্ত হয় নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম আচার ব্যবহার, পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম ইত্যাকার বিষয়ে কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানই এ পর্য্যন্ত মনোনিবেশ করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কেবল ত্রিকালদর্শী ঋষিপ্রণীত আয়ুর্ব্বেদই এ সকল বিষয়ের অনুধাবন করিয়াছেন এবং এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়াছেন বলিয়াই লোকে আয়ুর্ব্বেদকে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া মনে করেন না। আয়ুর্ব্বেদে ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, তাল, বেতাল, রাক্ষস, পিশাচ, গ্রহ, উপগ্রহ, যক্ষ, দেবলোক পিতৃলোক, স্বপ্নদর্শন, তন্ত্র মন্ত্র, জপ যজ্ঞ, দান দীক্ষা, পূজা, প্রণিপাত, প্রায়শ্চিত্ত, নিয়ম প্রভৃতি অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারের বিষয় বর্ণিত আছে বলিয়া লোকে উহাকে অলীক ও কল্পনা কল্পিত মিথ্যাদর্শন বলিয়া মনে করে, মহেশ্বরের ক্রোধই জ্বরোৎপত্তির নিদান, রোগরাজ যক্ষ্মা প্রথমে চন্দ্রদেবকে আক্রমণ করে ইত্যাদি কথা শুনিয়া উহাকে আজগুবি পৌরাণিক গল্প বলিয়া অবিশ্বাস করে, কার্য্য কারণের তাদৃশ শৃঙ্খলা নির্দ্দেশ নাই বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের কথায় সাধারণের বিশ্বাস করিতে ভয় করে সুতরাং আয়ুর্ব্বেদে পরকালতত্ত্বের অবতারণার কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত হাস্য করিয়া উঠিবেন। কিন্তু একটু ধীরভাবে উদার বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে কিছুই হাসিবার নয় কিছুই উপেক্ষণীয় নয়।

আয়ুর্ব্বেদ অতীব দুরূহ বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদের সহিত সকল বিদ্যারই সংশ্রব আছে বলিয়া, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সহিত সকল শাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিকে কবিরাজ অর্থাৎ পণ্ডিতরাজ বলিয়া থাকে, কতকগুলি অস্থি মাংস, শিরা, স্নায়ু, বসা, মজ্জা, পূয় এবং রক্ত লইয়াই যে আমাদের অঙ্গাবয়ব গঠিত অথবা কতকগুলি অস্থি মাংস শাক সবজি প্রভৃতি উপাদানে যে আমাদের অঙ্গাবয়ব পুষ্ট তাহা নহে, আমাদের সহিত পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ও সমুদয় দ্রব্যের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। অতি দূর স্থিত গ্রহ তারা নক্ষত্র মণ্ডলীও মানব শরীরের উপর হিতাহিতভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, মানব মূর্ত্তিই পরমেশ্বরের সান্নিধ্য সাধক প্রধান মূর্ত্তি বা পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। এই দেহ যন্ত্রই সেই বিশ্বব্যাপী

চৈতন্যের সেই অব্যয় অমৃতের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে তৎ সমুদায়ই এই মানব দেহে আছে এই জন্য এই মানব দেহকে মহর্ষি আত্রেয় বিশ্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন,—মহর্ষির প্রিয় শিষ্য অগ্নিবেশকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"পুরুষোঽয়ং লোকসম্মিত ইত্যুবাচ ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ যাবন্তোহি মূর্ত্তিমন্তো লোকে ভাববিশেষা স্তাবান্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে। * * তানেকমলা নিবোধ সম্যগুপবর্ণ্যমানানগ্নিবেশ। ষড়্ধাতবঃ সমুদিতা লোক ইতি শব্দং লভন্তে। তদ্ যথা—পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ু রাকাশং ব্রহ্ম চাব্যক্ত মিত্যেত এব চ ষড়্ধাতবঃ সমুদিতা লোক ইতি শব্দং লভন্তে। তস্য পুরুষস্য পৃথিবীমূর্ত্তি, রূপঃ ক্লেদ, স্তেজোঽভি সন্তাপো, বায়ুঃ প্রাণো, বিয়চ্ছিদ্রানি, ব্রহ্মআত্মা। যথা খলু ব্রাহ্মীবিভূতির্লোকে, তথাপুরুষেঽপ্যন্তরাত্মিকী বিভূতি, ব্রহ্মণেচ বিভূতির্লোকে প্রজাপতি রন্তরাত্মনো বিভূতিঃ পুরুষে স্বত্বং, যস্ত্বিন্দ্রো লোকে স পুরুষে অহঙ্কারঃ, আদিত্যস্ত্বাদানং রুদ্রোরোষঃ সোমঃ প্রসাদো, বসবঃ সুখং, অশ্বিনৌ কান্তিঃ, মরুদুৎসাহো, বিশ্বেদেবাঃ, সর্ব্বেন্দ্রিযাণি, সর্ব্বেন্দ্রিযার্থশ্চ, তমো মোহো, জ্যোতির্জ্ঞানং। যথা লোকস্য স্বর্গাদি স্তথা পুরুষস্য গর্ভাধানং, যথা কৃতযুগমেব বাল্যং, যথা ত্রেতা তথাযৌবনং যথা দ্বাপর স্তথা স্থাবির্য্যং, যথা কলিরেবমাতুর্য্যং, যথা যুগান্ত স্তথা মরণ মিত্যেবমনুমানেনানুক্তানামপি লোক পুরুষযো রবয়ব বিশেষাণাং অগ্নিবেশ সামান্যং বিদ্যাৎ।"

চঃ শাঃ ৫ম অঃ।

অর্থাৎ হে অগ্নিবেশ! তুমি আমার বর্ণনা বিষয়ে অনন্য মনে অভিনিবেশ করিলে বুঝিতে পারিবে জগতে যত কিছু উৎপত্তিমান পদার্থ বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই এই পুরুষে অর্থাৎ মানব দেহে দেখিতে পাইবে। ক্ষিতি অপ্‌তেজ বায়ু আকাশ ও অব্যক্তরূপী চৈতন্য এই ছয়টী লইয়া ষড়্ধাতুরূপে জগৎ যেরূপ প্রকটিত

হইয়াছে, মানব দেহরূপ এই পুরুষে একাধারে সে সমস্ত গুলি বিদ্যমান রহিয়াছে মানবের মূর্ত্তি পৃথিবী স্বরূপ, রস রক্ত শ্লেষ্মা বা ক্লেদাদি আপস্বরূপ, শারীরিক সন্তাপ তেজঃস্বরূপ, প্রাণ সকল বায়ুস্বরূপ ছিদ্রাদি সোতঃ সকল আকাশস্বরূপ, ও অন্তরাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিভাত হইতেছে। জগতে চৈতন্যের বিভূতি যেরূপ অভিব্যক্ত, মানব দেহে অন্তরাত্মা সেইরূপ দেদীপ্যমান, জগতে পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য প্রভাবে যেরূপ প্রজাপতির উদ্ভব, অন্তরাত্মার বিভূতিতে মানব দেহে সেইরূপ মনের উৎপত্তি, জগতে ইন্দ্র বলিয়া যিনি প্রসিদ্ধ পুরুষে অহঙ্কার নামে তিনি ঘোষিত, জগতে আদিত্য বলিয়া যিনি উদিত, পুরুষে আদান (গ্রহণ করা) বলিয়া তাহা অভিব্যক্ত, জগতে রুদ্র বলিয়া যিনি বিখ্যাত, পুরুষে রোষ (ক্রোধ) নামে তিনি প্রতিভাত, জগতে চন্দ্র নামে যিনি পরিচিত, পুরুষে প্রসাদ (প্রসন্নতা) রূপে তিনি অবস্থিত, জগতে বসু নামে যাঁহারা বিহিত, দেহে সুখ রূপে তাঁহা অনুভূত, জগতে যিনি অশ্বিনীকুমার দেহে তিনি কান্তি, জগতে বায়ু যিনি প্রবাহিত পুরুষে উৎসাহ, যাঁহারা দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ মানব দেহে তাঁহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ রূপে প্রকাশিত, জগতে যাহা অন্ধকার পুরুষে তাহা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা, জগতে যাহা জ্যোতিঃ, মানবে তাহা জ্ঞান রূপে বর্ত্তমান জগতে স্বর্গ বলিয়া যাহা বর্ণিত মানব শরীরে তাহা গর্ভাধান রূপে অনুমিত, জগতে সত্যযুগ বলিয়া যাহা বর্ণিত, মানবের বাল্য ভাবে তাহা প্রস্ফুটিত, ত্রেতাযুগ বলিয়া যাহা নির্দ্ধারিত মানবের যৌবনাবস্থায় তাহা পরিব্যক্ত, উক্তরূপ জগতের যাহা দ্বাপর ও কলি নামে অভিহিত মানব দেহে তাহা স্থবিরতা ও রুগ্নতা নামে অনুভূত এবং যাহা যুগান্তর, প্রলয় বলিয়া বর্ণিত মানব দেহে তাহা মরণ নামে বিবেচিত হইয়া থাকে, অতএব হে অগ্নিবেশ এতদ্ব্যতীত জগতের অন্যান্য অনুক্ত বিষয় সমূহের ও এইরূপ মানব দেহের সহিত সাদৃশ্য অনুমান করিয়া লইবে।

ক্রমশঃ—

কবিরাজ শ্রীবারাণসীনাথ গুপ্ত বৈদ্যরত্ন,
৬৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শরীর-ব্রণ এবং সদ্যোব্রণের অত্যাশ্চর্য্য মহৌষধ।

নিম্নে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ অর্থাৎ ক্ষতরোগের একটী অতি আশ্চর্য্য মহৌষধের প্রস্তুতি-প্রণালী এবং প্রয়োগ বিধি লিপিবদ্ধ হইল। ঔষধটী প্রথমতঃ আমার নিজ শরীরে পরীক্ষিত হইয়াছিল, তৎপর বহুস্থানে বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। ঔষধের উপাদান অনায়াস-লভ্য, ব্যয় যৎসামান্য এবং তৈয়ার করিবার কৌশলও খুব সহজ। একটু যত্ন করিয়া ঔষধটী তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করিলে অতি যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ক্ষতরোগ হইতে, অতি সামান্য খরচে সকলেই মুক্তিলাভ করিবেন।

অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে এবং ঘর্ষণ পেষণ পতন প্রভৃতি কারণে ঘেঁসিয়া, পিসিয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া গেলে যে ব্রণ অর্থাৎ ক্ষতরোগ উৎপন্ন হয় তাহার নাম সদ্যোব্রণ। আর বিবিধ কারণে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত এবং কফ ব্রণবাস্তু অর্থাৎ ত্বক্‌, মাংস, রস, রক্ত প্রভৃতির বিকার জন্মাইয়া শরীরে নানা বর্ণের নানাকারের যে ক্ষত উৎপাদন করে, তাহাকে শারীর ব্রণ বলে। বক্ষ্যমাণ মহৌষধ উক্ত উভয় প্রকার ব্রণরোগের মহৌষধ। এমন কি কুষ্ঠরোগের ক্ষত ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ জন্য দুশ্চিকিৎস্য ক্ষতরোগে প্রয়োগ করিলেও অত্যাশ্চর্য্য সুফল পাওয়া যায়। এক কথার ঘা নামে যে রোগ পরিচিত বক্ষ্যমাণ ঔষধ সেই রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ।

যে সূত্রে ঔষধটী পাওয়া গিয়াছে, চিকিৎসা-সম্মিলনীর পাঠকবর্গের অবগতির জন্য, তাহা নিম্নে কথিত হইল।

কিছুদিন গত হইল, এই কলিকাতা সহরে ট্রাম্‌কারে উঠিতে আমার পদস্খলন হয়। কারের কন্‌ডক্টর, সেই সময়ে আমার হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তন্মূহুর্ত্তে ড্রাইভার্‌ গাড়ীর মোশন্‌ খুব বৃদ্ধি করে। তজ্জন্য কন্‌ডক্টর্‌ আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; আমি তাহার হাত ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার পড়িয়া গেলাম। আমার বাম হাত খান দুই চাকার অবকাশ স্থানে পড়িয়াছিল, হাতের উপর দিয়া চাকা চলিয়া গেল। মেডিকেল্‌ কলেজে আমার হাত এম্‌পুটেশন করা হয়; তারপর বাড়ীতে থাকিয়া সাহেব ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসিত হইতে ছিলাম। ক্ষত দুরারোগ্য হইয়া উঠিল, গ্যাংগ্রিন্‌ হইবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে একদিন একজন ভিক্ষুক বেশী মহাপুরুষ দেখা দিলেন। আমার অবস্থা

পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন যে তিন দিনেই ঘা শুকাইবে। ঔষধ তৈয়ারের জন্য যাহা যাহা আনিতে বলিলেন, তাহা সংগৃহীত হইল, তিনি ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। আমার চিকিৎসকেরা সে ঔষধ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি নিষেধ না মানিয়া ঔষধ লাগাইলাম। মহাপুরুষের কথার অন্যথা হইল না আমি তিন দিনেই নিঃশেষে আরোগ্য লাভ করিলাম। ডাক্তারেরা অবশ্য অবৈজ্ঞানিক ঔষধের ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার পর আমি অনেক স্থলে ঔষধের মহোপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। নিম্নে ঔষধটীর প্রস্তুতি-প্রণালী লেখা গেল।

খাঁটি সরিষার তৈল ।/০ এক পোয়া (২০ তোলা) একখানি পরিষ্কার লোহার কড়াইতে রাখিয়া কাটের আগুনের মৃদু মৃদু জালে পাক করিবে। যখন তৈল নিস্ফেন হইবে, এবং স্থির হইয়া রহিবে অর্থাৎ ভাজা ভাজার ন্যায় পাক আসিবে তখন তাহাতে ১২ বারটী জীয়ন্ত টেংরা মাছ ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাছ গুলি খুব ভাজা হইয়া মুচ্‌মুচে হইলে নামাইয়া তৈল ছাঁকিয়া লইবে, মাছ ত্যাগ করিবে। এই তৈল ঘায়ে লাগাইতে হয়। পরিষ্কার নূতন তুলা উত্তমরূপে পিঁজিয়া তাহা তৈলে ভিজাইয়া ঘায়ে লাগাইয়া দিবে মধ্যে মধ্যে সেই তুলা তেল দিয়া ভিজাইয়া দিবে। তিন দিন এইরূপ করিতে হইবে। কদাচিৎ আরও দুই একদিন প্রয়োগ করিতে হয়।

আর একটী টোট্‌কা।

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া কি ছেঁচিয়া গেলে দেশী কৃষ্ণ চূড়া ফুলের পাতা জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত রোধ হয় এবং ব্যাথা হয় না পাকেও না।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ সেন কবিরাজ,
নেবুতলা বৌ বাজার।

কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের

ভারতবর্ষ মধ্যে একমাত্র সুলভ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

২০০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, শিমলা, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধই যে ভারতবাসীর পক্ষে একমাত্র উপযোগী, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঔষধের মূল্য অনুচিতরূপে অত্যধিক বৃদ্ধি করায় পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের পক্ষে এক প্রকার সাধ্যাতীত। স্বনামখ্যাত কবিরাজ অবিনাশ-চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় ঐরূপ অনুচিত মূল্য বৃদ্ধির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় ত্রিশ বৎসরাধিক কাল যাবৎ, দরিদ্র ভারতবাসীর প্রয়োজনানুসারে অমৃত তুল্য অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে প্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। আজ কাল নানা প্রকারের অসংখ্য বিজ্ঞাপনের প্রচার হওয়ায় মফস্বল-বাসিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে—

(১) বাস্তবিক বিশুদ্ধ কবিরাজী ঔষধ সুলভে পাওয়া যায় কোথায়?

(২) রোগ বিবরণ লিখিলে, বিনামূল্যে ও বিনা ডাক মাশুলে সুব্যবস্থা পাওয়া যায় কোথায়?

ইহার একমাত্র প্রকৃত উত্তর—ঔষধ ও সুব্যবস্থার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কবিরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয়ের কার্য্য পূর্ব্বরূপ চলিতেছে না সন্দেহ করিয়া যে যে সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিগণ আমাদিগকে পত্র লিখিতেছেন, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত লিখিতেছি যে, ভিষককুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহোদয়গণের ভাগিনেয় ও ছাত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষিত ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয় বিধ চিকিৎসা বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত কবিরাজ শ্রীপ্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের সহায়তায় এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্ রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কবিরত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা দ্বারা ঔষধালয়ের কার্য্য পূর্ব্ববৎ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ফলতঃ 'সত্যমেব জয়তি, সত্যে নাস্তি ভয়ং কচিৎ' এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর যে ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত, তাহার উন্নতি, অবশ্যম্ভাবিনী।

ম্যানেজার—

কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়,
২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন।

প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে চিকিৎসা-সম্মিলনী গ্রাহকবর্গের করকমলে অর্পণ করা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। তদ্বিষয়ে আমার এবং অন্যান্য লেখকের কিঞ্চিন্মাত্র আলস্য বা ঔদাস্য নাই। তথাপি যথা নিয়মে চিকিৎসা-সম্মিলনী মুদ্রিত হয় না এবং গ্রাহকগণের নিকট প্রেরণ করিতে পারি না। তাহার কারণ একমাত্র অর্থাভাব। আমি সম্মিলনীর সম্পাদকীয় ভার পাওয়া অবধি, সমস্ত ব্যয়ভার সম্মিলনীর ম্যানেজার বহন করিতেছেন। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাহকই স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করিতে ঔদাস্য করিতেছেন। তাহাতে সকল দিকেরই অসুবিধা ঘটিতেছে। গ্রাহকবর্গ যথা সময়ে সম্মিলনী পাইতেছেন না, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ মূল্য পরিশোধে উদাসীন রহিয়াছেন, আমরাও অর্থাভাবে নিয়মিতরূপে কাগজ চালাইতে পারিতেছি না। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যক সম্মিলনী গ্রাহকবর্গের নিকট প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় মূল্য পরিশোধ করিবেন, আমরাও অতঃপর বিশেষ উৎসাহান্বিত হইয়া মাসে মাসে সম্মিলনী আপনাদের নিকট প্রেরণ করিব। ফল কথা অর্থাভাবেই সম্মিলনী প্রকাশের একমাত্র অন্তরায়। গ্রাহকবর্গ অনুগ্রহ করিলে আমাদের যত্নের ত্রুটী হইবে না। সম্পাদক।

চিকিৎসা-সম্মিলনীর নিয়মাবলী।

১। চিকিৎসা-সম্মিলনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কলিকাতা সহরে ৩৲ টাকা ও মফঃস্বলে ডাকমাশুল সহ ৩৷৵০ আনা মাত্র। শিক্ষার্থী ও অসমর্থ পক্ষে সহরে ২৲ দুই টাকা ও মফঃস্বলে মূল্য ২৷৵০ আনা ধার্য্য রহিল। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। আশা করি এই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই সকলে স্ব স্ব দেয় বার্ষিক মূল্য আমার নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

২। 'সম্মিলনীর' কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গ্রাহকগণ প্রাপ্ত না হইলে এক মাসের মধ্যে তাঁহারা পত্রযোগে ঐ কথা সম্মিলনীর ম্যানেজারের গোচর করিবেন এবং পত্রে সংখ্যা ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৩। কবিরাজ, ডাক্তার বা গৃহস্থ অনুগ্রহপূর্ব্বক চিকিৎসা-সম্মিলনীর জন্য উপযুক্ত প্রবন্ধ পাঠাইলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং এই পত্রিকায় লেখকের নাম ধাম সহ প্রকাশিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, প্রবন্ধ ভাল হইলে, লেখককে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়া থাকে। আশা করি, বঙ্গের সুলেখক ও সুপণ্ডিত ডাক্তার, কবিরাজ মহাশয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব লিখিত প্রবন্ধ পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। গৃহস্থগণ তাঁহাদের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগগুলি লিখিয়া পাঠাইলে, তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শিমলা, কলিকাতা। — শ্রীপরেশনাথ শর্ম্মা, স্বত্বাধিকারী ও ম্যানেজার, চিকিৎসা-সম্মিলনী।

নূতন আকারে — পুরাতন আকারে

২য় খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। — ১২শ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

চিকিৎসা সম্মিলনী।

গোধাপদী রসায়ন।

(গোয়ালীয়া লতা)।

লেখক—শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্, ডি।

গোয়ালীয়া লতা দুই প্রকার—বড় ও ছোট। উভয়ের গুণ একই প্রকার। ইহার বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন্ নাম (Vites Pedata) ভাইটিস্ পিডেটা। ইহার পাতাগুলি গোসাপের পায়ের মতন, এইজন্য ইহাকে গোধাপদী কহে। ইহার অপর নাম হংসপদী।

সাধুরা এই লতাকে অমৃতলতা কহেন। আয়ুর্ব্বেদে এই ঔষধের বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়। ইহার অদ্ভুত রাসায়নিক শক্তি আছে বলিয়া ইহা শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্য কল্পরূপে ব্যবহার করিবার বিধি আছে। দেহের ক্ষয় বন্ধ করিবার নিমিত্ত মহাত্মাদিগের মধ্যে ইহার বড়ই আদর। ইহা কটুরসযুক্ত, উষ্ণগুণযুক্ত, বিষদোষ, ভূতদোষ, ভ্রান্তি ও অপস্মার নাশী, ব্রণশোধক ও রোপক, প্রমেহ নাশক ও ক্ষয়াপহ।

ইহা রক্তদুষ্টি, বিষদোষ এবং ...রোগে বিশেষ উপকারী। বিসর্প (Erysipelus) দাহ, অতিসার, লুতাদি বিষজনিত গরল ইহার প্রয়োগে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য এই ঔষধের প্রয়োগ বিধি।—বড় গোয়ালের মূল কাষ্ঠের অগ্নিতে আলু পোড়ার ন্যায় দগ্ধ করিয়া রাত্রিতে শিশিরে রাখিতে হয়। প্রাতে ঐ মূল ঘৃত, মধু ও দুগ্ধের সহিত এক আনা মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিতে হয়। অভ্যস্ত হইয়া গেলে সেবনের ঐ মাত্রা ক্রমশঃ বাড়াইতে হয়। এই ঔষধে ওলের মত মুখ কুটায়, এই হেতু ইহাকে পুড়াইয়া বা ঘৃতে ভাজিয়া মধু বা চিনি ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিবার

প্রথা আছে। ক্ষয়রোগ নিবারণ করিতে ইহার তুল্য সুলভ ও অদ্ভুত ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল। আজকাল অন্নাভাবে লোক ক্রমশঃই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক মাত্রেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, ক্ষয়কাস ক্রমশঃ ভীষণভাবে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

এই সহজসাধ্য ক্ষয়রোগনাশক রসায়নের গুণ জনসাধারণের উপকারার্থে প্রকাশ করিলাম, আশা করি পাঠকগণ প্রত্যেকেই ক্ষয়রোগ নিবারণের জন্য ইহার ব্যবহার সকলকে জানাইয়া দিবেন।

ব্রণরোগে গোয়ালিয়া লতার ব্যবহার।—যাবতীয় দুষ্টব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ (carbuncle), গরল গ্রন্থিবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ যারপর নাই ফলদায়ক। ছোট গোয়ালের পাতা শিলাখণ্ডে বাঁটিয়া প্রলেপ দিয়া অনেকেই (carbuncle) কারবন্কল্ প্রভৃতি উৎকট ব্রণরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বেদনাযুক্ত গ্রন্থিবিবর্দ্ধনে (inflamed gland) ইহার প্রলেপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। আঘাতজনিত বেদনা দূর করিতে, বড় গোয়ালের মূলের ন্যায় ঔষধ, অতি অল্পই দেখা যায়। বড় গোয়ালের মূল বাঁটিয়া সামান্য পরিমাণে চোটসাজি বা সোরা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে আঘাতজনিত সকল প্রকার বেদনা ও শোথ (inflamation) অচিরে আরোগ্য হয়। আমি শত শত স্থলে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহের শান্তির জন্য এই ঔষধ ব্যবহার করিবার আদেশ আছে। আঘাত এবং ব্রণরোগ মঙ্গল গ্রহের প্রকোপে ঘটিয়া থাকে, সেই হেতু এই ঔষধ, ঐ সকল রোগে ব্যবহার করিবার জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে।

আয়ুর্ব্বেদে নাড়ীব্রণ অর্থাৎ নালিঘা (Sinus) আরোগ্য করিতে হংসপদী তৈলের ব্যবহার আছে, এই তৈলে গোয়ালিয়া লতা, নিম ও জাতীপত্রের রস লাগে। বড় গোয়লে লতাকে চলিত ভাষায় গোঁড়গোবিন্দও কহে। গরুর পা ভাঙ্গিয়া গেলে গোয়ালারা গোঁড়গোবিন্দের মূল বাঁটিয়া সেই স্থানে লাগাইয়া দিয়া তাহা আরোগ্য করে। গোয়ালের মূল ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার দুষ্টব্রণে ও ক্ষতস্থানে ব্যবহার করিলে বিশেষ সুফল দর্শে।

মেহরোগে গোয়ালে লতা—বড় গোয়ালের মূল ঘৃতে ভাজিয়া চিনি, ঘৃত, মধু ও দুগ্ধের সহিত এক আনা মাত্রায় সেবন করিলে কঠিন মেহ রোগও আরোগ্য হয়। ছোট গোয়ালের পাতা ও মূল জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করিলে মেহ রোগে অশেষ উপকার হয়।

খাদ্য।*

লেখক—রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু এম্, বি, এফ্, সি, এস্।

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ, খাদ্য দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক ব্যাধিরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। খাদ্যের পরিমাণ অধিক হইলে যেমন অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যথোচিতপরিমাণ খাদ্যের অভাবেও দেহ সত্বর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং নানাবিধ রোগের আক্রমণের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। যথোচিতপরিমাণ খাদ্যের অভাব যে মনুষ্যের অকাল মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ, আমাদের দেশেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের অনেক লোকের অবস্থা এত শোচনীয় যে, তাহারা দুই সন্ধ্যা দূরে থাকুক, এক বেলাও পেট পুরিয়া খাইতে পায় না; এই আজীবনব্যাপী স্বল্পাহারের ফলে তাহাদের শরীর স্বতঃই এত দুর্ব্বল হইয়া থাকে যে, কোন একটী সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহারাই প্রথমতঃ এবং সহজে আক্রান্ত হয় এবং বহুসংখ্যক লোককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। পুনশ্চ খাদ্য বিশেষের পরিমাণের আধিক্য হইলে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমন অধিক মাংস খাইলে গাউট্ (gout) প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা, তেমনি যাঁহারা অধিক পরিমাণ শ্বেতসার ঘটিত খাদ্য ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, তাহাদের বহুমূত্র রোগ (Diabetes) জন্মিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। দেহ পুষ্টি ও বল বিধানের জন্য মাংস, তৈল, শ্বেতসার, শর্করা ও লবণ প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে কোন এক জাতীয় খাদ্যের অপ্রতুল হইলে, অন্য জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও শরীর পুষ্টিলাভ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। শুদ্ধ ভাত খাইলে যেমন শরীর রক্ষা হয় না, তেমনি শুদ্ধ মাংস খাইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারা যায় না। শরীর রক্ষা ও পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের জন্য সকল জাতীয় খাদ্য যথাপ্রয়োজন আহার্য্যরূপে গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। আমাদের দেশে "আপ্‌রুচি খানা" বলিয়া একটা কথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, অবস্থাবিশেষে কথাটীর কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই এরূপ প্রবৃত্তি দ্বারা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। দুষ্পাচ্য বা বিকৃত খাদ্যের উপর অনেকের রুচি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল খাদ্য কিছুদিন ব্যবহার করিলে

* সাহিত্য-সংহিতা হইতে উদ্ধৃত।

শরীর যে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহার প্রমাণের আবশ্যক নাই। লোকের প্রবৃত্তি ও শারীরিক অবস্থা ভেদে সুপাচ্য খাদ্যও দুষ্পাচ্য হইয়া থাকে। রোগীর রুচির উপর নির্ভর করিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে অনেক রোগীরই আরোগ্য লাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। সকল বস্তুই নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত হইলে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। শরীররক্ষারূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সেই খাদ্যসংগ্রহ যে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতে পারে, ইহা যিনি মনে করেন, তিনি নিতান্তই অদূরদর্শী।

খাদ্যের সহিত সাধারণের স্বাস্থ্য (Public health) বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। যথা-পরিমাণ খাদ্যের অভাবে জাতিগত দৌর্ব্বল্যের আধিক্য হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জাতিগত দৌর্ব্বল্য দ্বারা সাধারণের মধ্যে নানাবিধ রোগের বিস্তার প্রবলভাবে লক্ষিত হয়, এই ব্যাপারে সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়, যে কোন জাতির মধ্যে রোগের প্রাবল্য দৃষ্ট হইলে ঐ জাতি শীঘ্র দ্রারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া পড়ে। কর্ম্মক্ষম লোক রোগগ্রস্ত হইলে সমগ্র জাতির আয়ের হ্রাস হইয়া থাকে, সুতরাং দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহা পুনরায় রোগবৃদ্ধির ও অকাল মৃত্যুর সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগের বীজ খাদ্যের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল রোগ উৎপাদন করে। কলেরা, টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগ সমূহ অনেক সময় দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যের সহিত দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। পুনশ্চ কতকগুলি খাদ্য বিকৃত হইলে, উহার মধ্যে এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে; এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় শিশুদিগের খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের সবিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। যাহাতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং উহার সহিত কোনরূপে কোন রোগের বীজ মিশ্রিত হইতে না পরে, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং হইতেছে এবং ঐ সকল দেশে খাদ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা যথেষ্টপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

যে পদার্থের সহিত সাধারণের স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধি এরূপ সংশ্লিষ্ট, তদ্বিষয়ের আলোচনায় কিঞ্চিৎ সময় ক্ষেপণ করা বোধ হয় কেহই সময়ের অপব্যয় বলিয়া মনে করিবেন না।

খাদ্য বিষয়টী অতি বিস্তৃত—এক অধিবেশনে ইহার পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। অদ্য আমরা খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং খাদ্য পরিপাক-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব; বারান্তরে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ, কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

খাদ্য কাহাকে বলে ?

আমরা যাহা কিছু খাই, তাহাকেই যে খাদ্য বলা যাইবে, এমত নহে। চা, কাফি, কোকো প্রভৃতি পদার্থ খাদ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে পান খাওয়ার প্রচলন আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া পান একটী খাদ্যদ্রব্য নহে। অনেক স্ত্রীলোকে পোড়া মাটী যথেষ্ট পরিমাণে খাইলেও উহা খাদ্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

যাহা আমরা খাই এবং যাহা দ্বারা আমাদিগের শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, তাহাই যথার্থ খাদ্য। এরূপ কতকগুলি খাদ্য আছে, যে গুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই শরীর পোষণের উপযোগী হইয়া থাকে, যেমন দুগ্ধ, সুপক্ব ফল ইত্যাদি। অপর গুলি রন্ধনাদি কৃত্রিম উপায়ে পরিবর্ত্তিত না হইলে, ব্যবহারের উপযোগী হয় না; যথা—চাল, দাল, ময়দা, মৎস্য, মাংস, তরকারী ইত্যাদি। মানব-সমাজে সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত বহু প্রাচীনকাল হইতে রন্ধনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আদিম মনুষ্যগণ পশুবৎ অপক্ব মাংস ও ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করিত। এখনও ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ কোন কোন দ্বীপে এবং আফ্রিকা মহাদেশের স্থানে স্থানে কতিপয় অসভ্য জাতি আম মাংস ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে। মাংসাদি খাদ্য সিদ্ধ হইলে অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আম মাংস ভোজনের প্রথা সভ্যসমাজে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা নিতান্ত উপহাসাস্পদ। অপরন্তু চাল, ডাল, ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার (Starch) ঘটিত পদার্থ সুসিদ্ধ না হইলে মনুষ্যের পক্ষে সুপাচ্য হয় না। রন্ধন সভ্যতার একটী অঙ্গ এবং কলা বিদ্যার অন্তর্গত। যে স্ত্রীলোক ভালরূপে রন্ধন করিতে পারেন, কি স্বদেশী—কি বিদেশী, সকল সমাজেই তিনি সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে কাহারও বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাগণ রন্ধনকার্য্যে যোগ দিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা রন্ধনকার্য্যে সুপটু, এই সময়ে তাঁহারা আত্মীয়বর্গ ও প্রতিবাসিগণের নিকট হইতে কত আদর ও কত সম্মান পাইয়া থাকেন। যাঁহারা রন্ধনকার্য্যকে নীচ-বৃত্তি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী, পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে ভোজন করাইলে মনে কিরূপ আনন্দের উদয় হয়, যাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। বিলাতে অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনী-পরিবারের মহিলাগণ রন্ধন কার্য্যে যোগদান করা গৌরবের কার্য্য মনে করেন। কোন ভোজের সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ গৃহস্বামিনীর স্বহস্তে প্রস্তুত খাদ্য-

সামগ্রীর উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা রন্ধন কার্য্যে নিপুণা হইলে সাংসারিক ব্যায়েরও বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দিন দিন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যদি পরিবারস্থ রমণীগণ রন্ধনকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনেক খরচ বাঁচিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত বস্ত্রাদি সংগ্রহ এবং বালক বালিকা-দিগের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট আনুকূল্য হইতে পারে। সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, রন্ধনকার্য্য বিদ্যাশিক্ষার অন্তর্গত, সুতরাং ইহা সম্মান ও গৌরবের কার্য্য।

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের খাদ্যের প্রায়াজন হয় কেন? যাঁহারা কখনও উপবাস করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, উপবাসে শরীর কিরূপ দুর্ব্বল ও কার্য্যে অপটু হয়। দীর্ঘ উপবাসে শরীর শীর্ণ ও জীর্ণ হয় এবং অস্থি সমূহ প্রকটিত হইয়া উঠে। দুর্ভিক্ষের সময় কত হতভাগ্যের দেহ আহারাভাবে কঙ্কালসার হইয়া পড়ে। এরূপ লোককে কিছুদিন খাইতে দিলেই তাহার দেহ পুনরায় পুষ্ট ও সবল হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, আহার না পাইলে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং আহার পাইলেই শরীর পুনরায় পুষ্ট ও সবল হইয়া উঠে। অতএব প্রধানতঃ আহারের দুইটী কার্য্য দেখা যায়, (১) শরীরের পুষ্টিসাধন, (২) বল-বিধান।

আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, তাহাতেই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চলা, ফেরা, উঠা, বসা, দৌড়ান, ব্যায়াম করা প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করিবার সময় দেহস্থিত মাংসপেশী সমূহের নিয়ত আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইয়া উহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পাঠাভ্যাস, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্যের দ্বারাও মস্তিষ্কাদি শারীরিক যন্ত্রের ক্ষয় সাধিত হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তিকে ওজন করিয়া তাহাকে কোনও গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্য দেওয়া যায় এবং কার্য্য শেষ হইলে পুনরায় তাহার ওজন গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে ব্যক্তি ওজনে অনেক কমিয়া গিয়াছে। এরূপ ওজন কম হইবার কারণ কি? আমাদিগের দেহাভ্যন্তরে সর্ব্বদা এক প্রকার দহনক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা দেহের ক্ষয় সাধন হইতেছে। যেমন একখণ্ড কাষ্ঠ বা কয়লা পুড়িয়া গেলে উহা ওজনে অত্যন্ত হাল্‌কা হইয়া যায়, সেইরূপ দহনক্রিয়া দ্বারা আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহার ওজন কমিয়া যায়। যত অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করা যায়, শরীরের মধ্যে দহনক্রিয়া তত শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদিত হইতে থাকে, সুতরাং পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য দ্বারা শরীর অধিক পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য না করিলেও আমাদিগের শরীর নিয়ত দগ্ধ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের শরীরের অনেক কার্য্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না; আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়াও থাকি, তথাপি আমাদিগের শারীরিক যন্ত্রাদি (হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ ইত্যাদি) অবিরাম কার্য্য করিতে থাকিবে এবং তজ্জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদিগের শরীর যে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে, তাহার প্রমাণ কি? দুই একটী সামান্য পরীক্ষা করিলেই আমরা ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিব।

আমাদের শরীর যে দগ্ধ হইতেছে, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, বাহিরে কাঠ বা কয়লা পুড়িলে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, আমাদিগের শরীরের মধ্যে দহনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াও সেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে কাঠ বা কয়লা পুড়িলে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়, আমাদের শরীর পুড়িয়া কেবল তাপ উৎপন্ন হয় মাত্র, আলোক উৎপন্ন হয় না। এই দহন-ক্রিয়াকে মৃদু দহনক্রিয়া (Slow combustion) কহে।

কাঠ, পাথুরে কয়লা, তৈল, মোম বা চর্ব্বির বাতি, জীব-দেহ প্রভৃতি অর্গানিক্ পদার্থ মাত্রেই কার্ব্বন্ ও হাইড্রোজেন্ আছে; এই সকল পদার্থ বায়ু মধ্যে দগ্ধ হইবার সময় ঐ দুই মূল পদার্থ বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া যথাক্রমে কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ ও জলবাষ্প প্রস্তুত করে। কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ অদৃশ্য ও বর্ণহীন, সুতরাং চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখিতে না পাইলেও একটী রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা আমরা ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারি। নির্ম্মল চূণের জল জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, কিন্তু ইহা কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাসের সহিত সম্মিলিত হইলে ঘোলা হইয়া দুধের ন্যায় সাদা হইয়া যায়।

১ম পরীক্ষা :—একটি পরিষ্কার আয়তমুখ কাচের বোতলে এক আউন্স চূণের জল রাখিয়া বোতলটী উত্তমরূপে আলোড়ন কর। চূণের জলের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, পূর্ব্বে যেরূপ স্বচ্ছ ছিল, সেইরূপই থাকিবে। এক্ষণে একটি ছোট বাতি বঁড়শির ন্যায় বাঁকান লোহার শিকে আবদ্ধ করিয়া জ্বালাইয়া বোতলের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং একখানি মোটা কাগজ বোতলের মুখে চাপা দাও। অল্পক্ষণ পরেই দেখিবে বাতিটী নিবিয়া গিয়াছে। এক্ষণে বাতিটী সরাইয়া বোতলের মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ কর এবং উহাকে উত্তমরূপে আলোড়ন কর, দেখিবে চূণের জল দুধের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে।

চূণের জল এরূপ ঘোলা হইল কেন? কার্ব্বন্ মোমবাতির একটী উপাদান। বাতি পুড়িবার সময় উহার কার্ব্বন্ বোতলের বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাসে পরিণত হইয়াছে এবং উহাই চূণের জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া চূণের জলকে দুধের ন্যায় সাদা করিয়াছে।

বাতি পুড়িবার সময় উহার অপর উপাদান হাইড্রোজেন্ বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল-বাষ্প প্রস্তুত করে। জলবাষ্প অদৃশ্য, সুতরাং যতক্ষণ উহা ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুর আকার ধারণ না করে, ততক্ষণ উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বাতি পুড়িলে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা একটি সামান্য পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

২য় পরীক্ষা:—একটি জ্বলন্ত বাতির উপর একটি শুষ্ক ও স্বচ্ছ কাচ-পাত্র ধারণ কর, কাচপাত্র স্বল্পকালের মধ্যে অস্বচ্ছ দেখাইবে। এক্ষণে কাচপাত্রের অভ্যন্তর প্রদেশ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে দেখিতে পাইবে যে তথায় সূক্ষ্ম জলকণা জমিয়া রহিয়াছে।

বাতি পুড়িবার সময় তন্মধ্যস্থিত হাইড্রোজেন্ বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া অদৃশ্য জল-বাষ্প প্রস্তুত করে; উহা কাচপাত্রের শীতল গাত্র সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুর আকার ধারণ করিলে পর আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

তবেই দেখা গেল যে, কার্ব্বন্ ও হাইড্রোজেন্‌যুক্ত পদার্থ বায়ু মধ্যে দগ্ধ হইলে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ ও জল উৎপন্ন হয়। বাতি, কাঠ, পাথুরে কয়লা প্রভৃতি পদার্থের ন্যায় কার্ব্বন্ ও হাইড্রোজেন্ আমাদের শরীরের উপাদান; এই দুই পদার্থ নিশ্বাস গৃহীত বায়ুস্থিত অক্সিজেন্ সংযোগে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে এবং তাহার ফলস্বরূপ কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ ও জল উৎপন্ন হইতেছে। এই কার্ব্বনিক্ এসিড গ্যাস্ ও জল সর্ব্বদা আমাদিগের প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে, কিন্তু উহারা বর্ণহীন ও অদৃশ্য বলিয়া আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে যে সকল পরীক্ষা দেখাইয়াছি, তদ্দ্বারাই এই অর্থের সত্য প্রমাণ করা যাইতে পারে।

৩য় পরীক্ষা:—একটি কাচপাত্রে নির্ম্মল চূণের জল লইয়া একটি কাচের নল সংযোগে তন্মধ্যে কয়েক বার ফুৎকার দাও, দেখিতে পাইবে চূণের জল দুধের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, কার্ব্বনিক্ এসিডের সংযোগেই চূণের জল ঘোলা হয়; এস্থলে চূণের জল ঘোলা হওয়াতে বুঝা গেল যে আমাদিগের প্রশ্বাসের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ নির্গত হইতেছে। দেহস্থ কার্ব্বন্ দগ্ধ হইয়াই এই কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপে প্রশ্বাসের সহিত যে জল বহির্গত হইতেছে, তাহা আমরা সহজেই প্রমাণ করিতে পারি। একখানি স্বচ্ছ দর্পণ লইয়া তাহার উপর কয়েকবার প্রশ্বাস ত্যাগ কর বা হাই দাও, দেখিতে পাইবে দর্পণখানি ঘোলা হইয়া গিয়াছে; অস্বচ্ছ স্থানে হাত দিলে হাতে জলের দাগ লাগিবে। শীতকালে প্রত্যূষে হাই তুলিলে মুখ হইতে শ্বেতবর্ণ ধূমাকার পদার্থ নির্গত হইতে দেখা যায়। প্রশ্বাসস্থিত অদৃশ্য জল-বাষ্প বাহিরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া ধূমের আকারে আমাদিগের নয়নগোচর হয়।

অতএব আমাদের শরীর যে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। যদি বল যে বাতিটী দগ্ধ হইবার সময় যেমন জলিতে থাকে, আমাদের শরীর দগ্ধ হইবার সময় সেইরূপ জলে না কেন? তাহার কারণ এই যে, আমাদিগের শরীরের দহনক্রিয়া অতি মৃদুভাবে সংসাধিত হইয়া থাকে, সুতরাং উহাতে কেবল তাপই উৎপন্ন হয়, আলোক উৎপন্ন হয় না। জীবিত প্রাণীর দেহ স্পর্শ করিলে উষ্ণতা অনুভূত হয়, মৃত প্রাণীর দেহ অত্যন্ত শীতল। ইহার কারণ এই, মৃত দেহে শ্বাস-ক্রিয়ার অভাব হেতু দেহভ্যন্তরে অক্সিজেন্ প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং দহনক্রিয়া সম্পাদিত হয় না বলিয়া তাপের অভাব হেতু উহা শীতল হইয়া পড়ে। এই দহন-ক্রিয়াজনিত তাপ দ্বারা আমাদিগের শারীরিক উষ্ণতা সাধারণতঃ ৯৮৷৷০ ডিগ্রিতে থাকে। তাপমান যন্ত্র (Thermometer) দ্বারা এই তাপের পরিমাণ করিতে পারি। জ্বর হইলে শারীরিক দহনক্রিয়া অধিকতর তেজের সহিত সম্পাদিত হয়, সুতরাং শরীরের তাপ ৯৮৷৷০ ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কার্ব্বন-ঘটিত পদার্থ দগ্ধ হইলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং ওজনে কমিয়া যায়। আমাদের শরীরও পূর্ব্বকথিত মৃদু দহনক্রিয়া দ্বারা নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং ওজনে কমিয়া যাইবার কথা, কিন্তু যদি আমাদের সর্ব্বদা ওজন হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের ওজন একই থাকে, অথবা ওজন ক্রমে অল্প অল্প করিয়া বাড়িয়াও যায়—কোনও অসুখ না হইলে কমিতে দেখা যায় না। এইরূপ হইবার কারণ কি?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা কোনরূপ পরিশ্রম করি বা না করি, আমাদিগের শরীর নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই ক্ষয়ের যথোচিত পূরণ না হইলে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হয় এবং পূরণের এককালীন অভাবে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক কি উপায়ে আমরা এই ক্ষতি পূরণ করিতে পারি। যেমন কল চালাইতে পাথুরে কয়লার প্রয়োজন হয়, এবং একবার পাথুরে কয়লা পুড়িয়া গেলে আবার নূতন

করিয়া পাথুরে কয়লা দিতে হয়, নতুবা কল বন্ধ হইয়া যায়, তেমনি আমাদের দেহ-যন্ত্রের পরিচালনার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পরিপাক হইলে পর উহা শোণিত দ্বারা শোষিত হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত হয় এবং যে স্থানে যে দ্রব্যের অভাব এবং যতটুকু অভাব, ঐ স্থান শোণিতস্থিত খাদ্য হইতে তাহা গ্রহণ করে; এইরূপে শারীরিক ক্ষয় নিবারণ ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। খাদ্যের কিয়দংশ শোণিতস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকে। পাথুরে কয়লার মধ্যে যে শক্তি (Potential energy) নিহিত থাকে, দগ্ধ হইবার সময় তাহাই প্রথমতঃ তাপ ও পরে কার্য্যকরী-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া কল চালাইতে সক্ষম হয়। আমাদের খাদ্যের মধ্যেও এইরূপ প্রচুর শক্তি অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে। খাদ্য অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া দগ্ধ হইবার সময় উহা হইতে আমাদের শরীরের তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তির উদ্ভব হয়। আমরা যে সকল পদার্থ সচরাচর খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাদিগের মধ্যে আমাদিগের শরীরের সমস্ত উপাদানই বিদ্যমান থাকে, সুতরাং খাদ্যগ্রহণই শারীরিক ক্ষয়নিবারণ ও শক্তিসঞ্চয়ের একমাত্র উপায়।

শরীরের যেমন ক্ষয়পূরণ আবশ্যক, তেমনই উহার বৃদ্ধি সাধনেরও প্রয়োজন আছে। একটি সদ্যোজাত শিশু দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কালে একজন পূর্ণদেহ মনুষ্যে পরিণত হয়। উভয়ের শরীরের গঠনের সাম্য থাকিলেও বিকাশ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ উভয়ের শরীরের দৈর্ঘ্য ও ভার বিচার করিলেই শিশুর শরীর কত পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণদেহ মনুষ্যে পরিণত হয়, তাহা বোধগম্য হইবে। সদ্যোজাত শিশুর শরীরের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে, আর পূর্ণদেহ মানব গড়ে ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। সদ্যোজাত শিশুর ওজন ৪।৫ সের মাত্র, একজন পূর্ণদেহ সুস্থকায় মনুষ্যের ওজন প্রায় ১॥০ মণের কম হইতে দেখা যায় না। শারীরিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথোচিত বিকাশ প্রাপ্ত হয়। জন্ম হইতে ২৫ বা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধির সময়, তৎপরে শরীর আর বাড়ে না—অনেক দিন পর্য্যন্ত একই ভাবে অবস্থিতি করে; বৃদ্ধ বয়সে শরীরের ক্ষয় আরম্ভ হয়। অতএব খাদ্য যে শুদ্ধ শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে তাহা নহে, অন্ততঃ ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সহায়তা করে—শিশুকে বালক, বালককে যুবক এবং যুবককে পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত করে। শিশু, বালক ও যুবকের যথেষ্টপরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন, কেননা তাহাদিগের শরীরের ক্ষয়পূরণ ব্যতীত উহার বৃদ্ধিসাধনেরও একান্ত প্রয়োজন; যথেষ্ট খাদ্যের অভাব হইলে তাহাদিগের শরীর শুষ্ক, কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তবে যথেষ্ট খাদ্য অর্থে অপরিমিত ভোজন নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রধানতঃ চারি প্রকার ;—

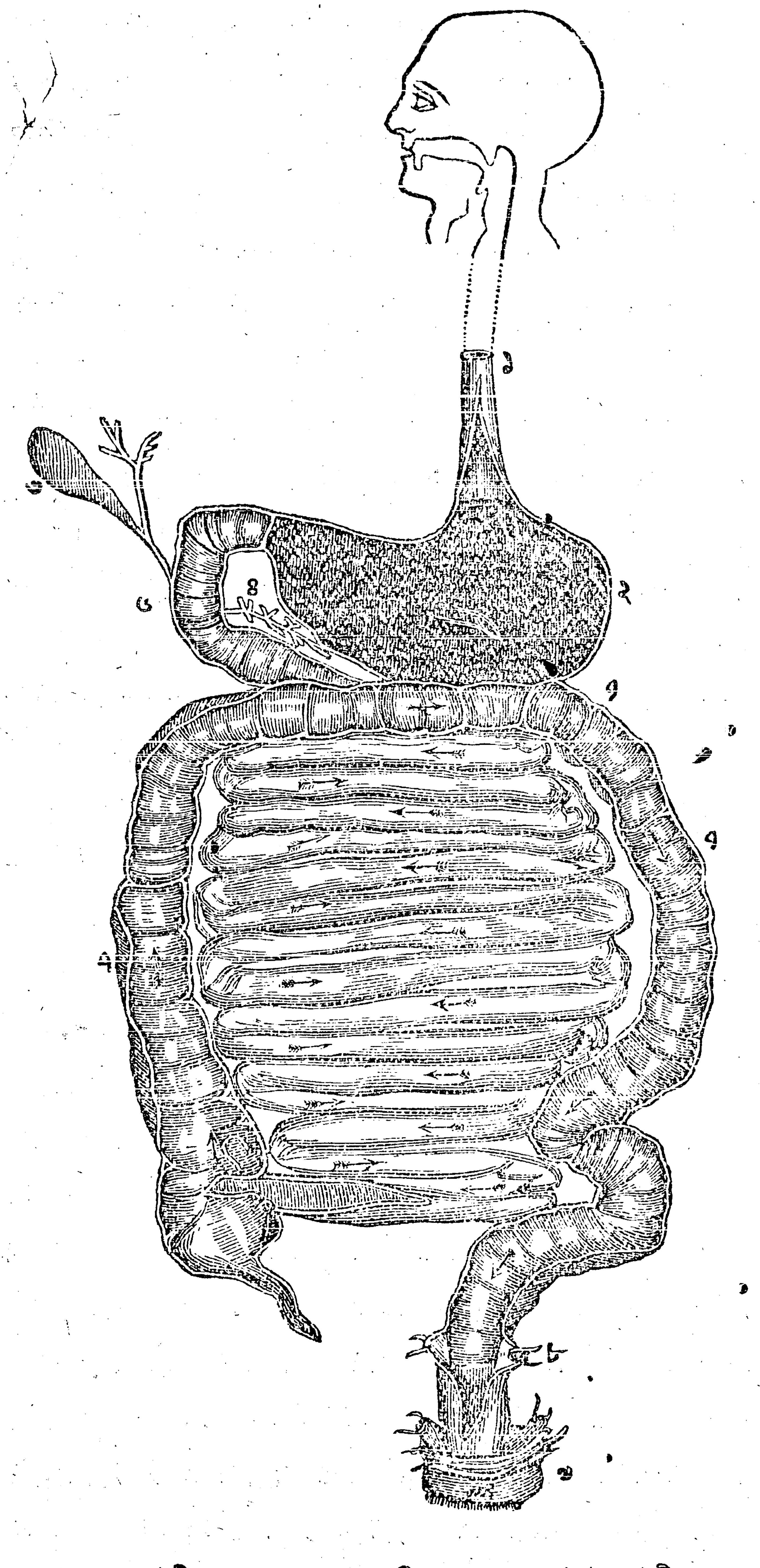

১। অন্ননালী ২। পাকাশয় ৩। পিত্তকোষ ও তাহার নালী ৪। প্যান্‌ক্রিয়াসের নালী ৫। ডিওডিনাম্ ৭।৮। বৃহদন্ত্র ৯। মলদ্বার

১। শারীরিক ক্ষয় নিবারণ। ২। দেহের বৃদ্ধিসাধন। ৩। তাপজনন। ৪। বলউৎপাদন।

সকল খাদ্যই সমভাবে এই চারিটী কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী নহে। কোন খাদ্য শরীরের ক্ষয়-নিবারণ বা বৃদ্ধিসাধনের উপযোগী, কোনটী বা তাপ উৎপাদনের সবিশেষ সহায়তা করে, অপর কোনটী বিশেষভাবে কার্য্যকরী শক্তির জনয়িতা। কোন্ খাদ্যের কিরূপ কার্য্য, যথাস্থানে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পরিপাক-প্রণালী।

আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহারা শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে পর শরীর পোষণের উপযোগী হইয়া থাকে। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ, রুটী প্রভৃতি যে কোন

পদার্থই আমরা ভক্ষণ করি না কেন, উহারা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আমাদিগের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের ক্ষয় পূরণ বা পোষণ সাধন করিতে পারে না। উহারা দেহস্থ বিবিধ যন্ত্র ও নানাবিধ পাচকরস সাহায্যে আদি অবস্থা হইতে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহরক্ষার উপযোগী হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ যন্ত্র দ্বারা কিরূপে খাদ্য দ্রব্যের এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাই এস্থলে আমাদিগের আলোচনার বিষয়। এই চিত্র কয়খানি দেখিলেই যে সকল যন্ত্র দ্বারা পরিপাক-কার্য্য সংসাধিত হয়, তাহাদিগের গঠন এবং শরীরের কোন্ স্থানে কোন্টী অবস্থিতি করে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

(মুখগহ্বর, অন্ননালী, পাকাশয়, যকৃৎ, প্যান্‌ক্রিয়াস্ (Pancreas), ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র প্রভৃতির চিত্র প্রদর্শন।)

একটি বহুদূরবিস্তৃত সুড়ঙ্গ পথে খাদ্যের পরিপাক-ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। ইহার একটি প্রবেশ-দ্বার এবং একটি নির্গম-দ্বার আছে। সুড়ঙ্গের প্রবেশ-দ্বার আমাদের মুখ এবং মলদ্বার ইহার নির্গম পথ। মুখের ভিতর দন্ত, জিহ্বা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রাদি আছে, তাহারা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য-পরিপাকের সহায়তা করিয়া থাকে।

দন্ত।—পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টী করিয়া দন্ত আছে। ইহারা পরিপাক কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। শিশুর ন্যায় শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিলে দাঁতের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কঠিন সামগ্রী ভক্ষণ করিতে হইলে দাঁত নহিলে চলে না। দাঁত পড়িয়া গেলে আহার সম্বন্ধে যে বিশেষ অসুবিধা ঘটে, এতদ্বিষয়ে অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তির খেদোক্তি সময়ে সময়ে আমাদিগের শ্রবণগোচর হয়। একটা চলিত কথায় বলে, "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না"—দাঁত পড়িয়া গেলে খাইবার যে যথেষ্ট অসুবিধা হয়, এই কথাই তাহার প্রমাণ। দাঁতের প্রধান কার্য্য খাদ্য-দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া উহাকে সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করা। খাদ্য বড় বড় টুকরা অবস্থায় পাচক রসের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে পারে না, সুতরাং উহার পরিপাক হইতে বিশেষ বিলম্ব হয়; খাদ্য সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হইলে পাচকরস উহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণ করিতে পারে। আমাদের দাঁতই খাদ্যকে সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করিবার প্রধান যন্ত্র। দন্তের আকার ভেদে তাহাদের কার্য্যও ভিন্ন হইয়া থাকে, আমাদের সম্মুখের দাঁতগুলি ধারাল ও অনেকটা কোদালের ফলার মত চ্যাটাল; এগুলি দ্বারা আমরা খাদ্য দ্রব্য ছেদন করিয়া থাকি, এজন্য এ গুলিকে ছেদনদন্ত (Incisors) বলে। প্রত্যেক মাড়িতে চারিটি করিয়া ছেদনদন্ত আছে। ছেদনদন্তের

পরেই একটি করিয়া দুই দিকে দুইটী সূচল দন্ত আছে, ইহাকে শ্বা-দন্ত কহে; ইংরাজীতে ইহাকে Canine tooth বলে। কুকুর, বিড়াল, বাঘ প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুদিগের এই দন্ত সবিশেষ বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ঘোড়া, গরু, মেষ, মহিষ প্রভৃতি এককালীন উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাণিগণের এই দন্ত নাই। আমাদের শ্বা-দন্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা মাংসভোজী বিড়াল কুকুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও পরিপুষ্ট নহে। হাড় হইতে মাংস ছিঁড়িয়া লইবার পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়তা করে, এজন্য ইহা কুকুর, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুর পক্ষে একান্ত আবশ্যক; ইহারা আমাদের মাড়িতে থাকিয়া ছেদন কার্য্যের সহায়তা করে মাত্র। শ্বা-দন্তের পশ্চাতে প্রত্যেক মাড়িতে ৫টী করিয়া উভয় পার্শ্বে দশটী পেষণদন্ত (Bicuspids and Molars) আছে। উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুমাত্রেরই পেষণদন্তের সবিশেষ আধিক্য ও বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ফল, মূল, পাতা, ডাল পালা প্রভৃতি সকল পদার্থই বিশেষরূপে চর্ব্বণ করিবার প্রয়োজন হয়; সুতরাং হাতী, ঘোড়া, গরু, মেষ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি সকল জন্তুরই এই দাঁতের সংখ্যা অধিক এবং তাহারা সবিশেষ পরিপুষ্টিও লাভ করিয়া থাকে। দন্তের গঠনের সহিত খাদ্যের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রসনা।—খাদ্য মুখের ভিতর প্রবেশ করিলে পর দন্ত দ্বারা উহা উত্তমরূপে ছিন্ন ও চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হয়। আমাদের রসনাও খাদ্যদ্রব্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশগুলি একত্রিত এবং দন্তের নিকট উহাদিগকে আনয়ন করিয়া দন্তের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে, সুতরাং রসনা যে শুদ্ধ আহার্য্য দ্রব্যের স্বাদ লইতে ন্যস্ত তাহা নহে, উহা আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পরিশ্রমের সুফল ভোগ করিয়া থাকে মাত্র।

লালা।—মুখের ভিতর যে খাদ্য শুদ্ধ চর্ব্বিত হয় তাহা নহে, মুখের লালার সহিত উহা উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই লালাকে ইংরাজীতে স্যালাইভা (Saliva) কহে; ইহা জলের ন্যায় তরল পদার্থ। আমাদের মুখের আশে পাশে তিনটী গ্ল্যাণ্ড্ (Gland) আছে, তন্মধ্যে লালা প্রস্তুত হইয়া নলযোগে মুখের অভ্যন্তরে আগমন করে এবং খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে ভিজাইয়া নরম করে এবং ভাত, ডাল, ময়দা, আলু প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আমরা ভক্ষণ করি, তাহাদিগের শ্বেত-সার (Starch) অংশকে এক প্রকার চিনিতে পরিণত করে। লালার মধ্যে টায়ালিন্ (Ptyalin) নামক যে এক প্রকার পাচক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তদ্দ্বারাই এই কার্য্য সংসাধিত হয়। শ্বেত-সার এইরূপে চিনিতে পরিণত না হইলে আমরা উহা

পরিপাক করিতে পারি না; সুতরাং খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য মুখের লালা একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। আমাদিগের এ দেশের লোকের অধিকাংশ খাদ্যই শ্বেতসারঘটিত, অতএব যাহাতে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের উপর মুখের লালার ক্রিয়া অধিকক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত। খাদ্য ভাল করিয়া চিবাইয় একটু ধীরে ধীরে খাইলে খাদ্যের উপর লালার ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেকের অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যাস; ইহা বড় কুঅভ্যাস এবং ইহাতে অজীর্ণতা রোগ উৎপন্ন হয়। তাড়াতাড়ি খাইলে ভক্ষ্য দ্রব্য ভাল করিয়া চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইতে পারে না এবং যথা পরিমাণ লালার সহিত মিশ্রিত হইবার সময় না পাইয়া অধিকাংশ শ্বেত-সারই অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়া যায়—চিনিতে পরিণত হয় না; সুতরাং খাদ্য যে কেবল দুষ্পাচ্য হইয়া অজীর্ণতা রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সারভাগ আমাদের দোষে অসার পদার্থরূপে শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া যায়। আমাদিগের ধীরে ধীরে আহার করা কর্ত্তব্য—অনেক সময় ধীরে ধীরে আহার করা অজীর্ণতা রোগের একটী মহৌষধ। আমাদের দেশে "নাকে মুখে গোঁজা" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে; এই কুঅভ্যাসটী কত দূর অনিষ্টকর তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।

বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার সর্ মাইকেল্ ফষ্টার্ চর্ব্বণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন,—ইহা নিঃসন্দেহ যে খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে আমরা প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার্য্য সামগ্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকি এবং আমাদিগের দেহ শীঘ্র অতি ভোজনের বিষময় ফলভোগ করে। খাদ্য অধিকক্ষণ চর্ব্বণ করিলে ক্ষুধার অস্বাভাবিক প্রকোপ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং যে পরিমাণ ক্ষুধা তদধিক খাদ্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয় না। এই সু অভ্যাসের ফলে আমরা সহজ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করিতে পারি এবং অধিক মাংস খাইবার প্রবল লালসার নিবৃত্তি হয়। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইলে তাহার অধিকাংশই পরিপাক হইয়া যায়, অতি সামান্য অংশ মলরূপে পরিত্যক্ত হয়, সুতরাং মলের পরিমাণ কম হয়। ইহাও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে যাহারা খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করে, তাহাদের মলে অধিক দুর্গন্ধ হয় না, মল বিকৃত হইলেই সবিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। মল বিকৃত হইলে তন্মধ্যস্থিত দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে, সুতরাং উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিলে আমরা যে নানাবিধ রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারি, শুদ্ধ তাহাই নহে, অনাবশ্যক খাদ্যের জন্য যে অপব্যয় হয় তাহাও নিবারণ করিতে পারি।

যে সকল গ্লাণ্ড্ (gland) হইতে লালা নিঃসারিত হয়, তাহাদের মধ্যে প্যারটিড্ (Parotid), সব্‌ম্যাক্সিলারি (Sub maxillary) এবং সব্‌লিঙ্গুয়াল্ (Sublingual) এই তিনটীই প্রধান। প্যারটিড্ গ্লাণ্ড্ (Parotid gland) কাণের পাশে অবস্থিত, অপর দুইটী নীচের চোয়ালের (Lower jaw) ভিতরের দিকে অবস্থিত; সকল গুলিই এক একটী নালী দ্বারা মুখের অভ্যন্তর প্রদেশের সহিত সংযুক্ত। আমরা যাহাকে কর্ণমূল ফোলা বলিয়া থাকি, তাহার প্যারটিড্ গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ মাত্র। এই তিনটী গ্লাণ্ড্ ব্যতীত মুখের ভিতর বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্ল্যাণ্ড্ আছে, তাহা হইতে নালের ন্যায় এক প্রকার আটাল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া চর্ব্বিত খাদ্যের ডেলাকে পিচ্ছিল করিয়া সহজ গলাধঃকরণের উপযোগী করে।

ফেরিংক্স্ (Pharynx)।—মুখগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগকে ফেরিংক্স্ কহে, ইহা হইতে অন্ননালী বা ইসফেগসের (Æsophagus) আরম্ভ। ফেরিংক্সে যে সকল মাংশপেশী আছে তাহারা খাদ্যের ডেলাকে পশ্চাদ্দিকে অন্ননালীর মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। এই স্থানে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাণ্ড্ আছে, তাহা হইতে আঠাল লালা নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের ডেলাকে আরও পিচ্ছিল করিয়া দেয়, সুতরাং উহা সহজে অপ্রশস্ত অন্ননালীর মধ্য দিয়া গমন করিতে পারে।

অন্ননালী (Œsophagus)।—খাদ্য পরিপাকের যে সুড়ঙ্গ পথের উল্লেখ করা গিয়াছে অন্ননালী (চিত্র, ১) তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত অংশ; এই সরু নলটী ৯ বা ১০ ইঞ্চি মাত্র লম্বা। ফেরিংক্স্ হইতে আরম্ভ হইয়া কণ্ঠ বা শ্বাস নালীর পশ্চাদ্দেশ বাহিয়া উদর গহ্বরে অবস্থিত পাকাশয়ে শেষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে মাংসপেশী আছে, তাহাদিগের আকুঞ্চন দ্বারা খাদ্যের ডেলা ক্রমে নীচে নামিয়া পাকাশয়ে উপস্থিত হয়। অন্ননালীর সম্মুখেই কণ্ঠ নালীর ছিদ্র, কণ্ঠনালী দ্বারা শ্বাস বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে। খাদ্যকে প্রথমতঃ কণ্ঠনালীর ছিদ্র অতিক্রম করিয়া অন্ননালীতে প্রবেশ করিতে হয়। যদি খাদ্যের একটী ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কণ্ঠনালীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে বিষম কষ্ট উপস্থিত হয়; চলিত কথায় ইহাকে আমরা "বিষম লাগা" বলিয়া থাকি। "বিষম" লাগিলে কি ভয়ানক কষ্ট হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাশিতে কাশিতে খাদ্যের অংশটুকু কণ্ঠনালী হইতে বহির্গত হইয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগের যন্ত্রণার অবসান হয় না। একটী অপূর্ব্ব কৌশল দ্বারা খাদ্য গলাধঃকৃত হইবার সময় কণ্ঠনালীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কণ্ঠনালীর উপরিভাগে বাক্সের কব্জা সংযুক্ত ডালার ন্যায় একখানি আবরণ আছে, ইহাকে উপজিহ্বা (Epiglottis) কহে। খাদ্যের ডেলা ফেরিংক্সের পশ্চাতে যাইবামাত্র

ইহা আপনাপনি পড়িয়া যাইয়া কণ্ঠনালীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়; সুতরাং খাদ্য এই আবরণের উপর দিয়া অন্ননালীতে প্রবেশ করে। যদি ইহা কোন কারণে খাদ্য গলাধঃকরণ করিবার সময়ে খোলা থাকে, তাহা হইলে খাদ্যের অংশ কণ্ঠনালীর মধ্যে যাইবার সম্ভাবনা এবং এইরূপ হইলে "বিষম" লাগিয়া যায়। এমন কি কিছু বেশী পরিমাণ খাদ্য কণ্ঠনালীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। শিশুদিগকে সাবধানের সহিত না খাওয়াইলে কখন কখন এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। শিশু যখন কাঁদিতে থাকে, তখন উহার মুখের ভিতর কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত নহে, কারণ এই সময়ে কণ্ঠনালীর মুখের আবরণ খুলিয়া যায় এবং খাদ্যদ্রব্যের অংশ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

পাকাশয় (Stomach)।—অন্ননালীর পরেই পাকাশয় (চিত্র, ২)। ইহার আকার ভিস্তির ক্ষুদ্র মোশকের ন্যায়; ইহার এক দিক অন্ননালীর সহিত ও অপরদিক ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত সংযুক্ত। ইহা আমাদিগের উদর গহ্বরের উপরিভাগে বাম পার্শ্বে অবস্থিত। পাকাশয়ের উপরিভাগ নিম্নাংশ হইতে অধিকতর বিস্তৃত। ইহার মধ্যে মাংসপেশী আছে, সেগুলির আকুঞ্চনে খাদ্য দ্রব্য পাকাশয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া পাকাশয় নিঃসৃত গহ্বরের সহিত উত্তমরূপে মিলিত হয়। অনুবীক্ষণ সাহায্যে পাকাশয়ের অভ্যন্তরাংশ মৌচাকের ন্যায় প্রতীত হয়। মৌচাকের এক একটী ঘরে অসংখ্য নালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাকাশয়ের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাণ্ড (Gland) আছে, তাহাদিগের মধ্যে এক প্রকার পাচক রস (Gastric juice) প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নালীর মুখ দিয়া পাকাশয়ে ক্ষরিত হয় এবং খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহার পরিপাক সাধন করে। এই পাচক রসের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী পদার্থ থাকে; একটীর নাম পেপ্সিন্ (Pepsin), এবং অপরটী হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড্ (Hydrochloric acid)। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব, ছানা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য এই দুইটী পদার্থ ব্যতীত পরিপাক হইতে পারে না। পাকাশয়ে যতক্ষণ খাদ্য পরিপাক হইতে থাকে, ততক্ষণ পাকাশয়ের নিম্ন মুখ (Pycorus) দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকে; পাকাশয়ের কার্য্য শেষ না হইলে পর খাদ্যদ্রব্যকে পাকাশয় হইতে অন্ত্রে নামিতে দেয় না।

অন্ত্র (Intestine)।—পাকাশয়ের পরেই অন্ত্র (চিত্র, ৫, ৭, ৮); সুড়ঙ্গের এই অংশই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। অন্ত্র প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত—ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small instestine) এবং বৃহৎ অন্ত্র (Large instestine। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র একত্রে প্রায় ১৮ হাত লম্বা, তন্মধ্যে ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রায় ১৪ হাত এবং বৃহৎ অন্ত্র ৪ হাত মাত্র।

ক্ষুদ্র অন্ত্র, বৃহৎ অন্ত্র অপেক্ষা আকারে অনেক অপ্রশস্ত। উদর গহ্বরের পরিসর অল্প বলিয়া এই দীর্ঘ অন্ত্র অনেক পাকে জড়িত হইয়া অবস্থিতি করে। ক্ষুদ্র অন্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। পাকাশয়ের অব্যবহিত পরেই ৮।১০ ইঞ্চি পরিমিত অংশের নাম ডিওডিনম (Deodenum চিত্র, ৫); এই ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে একটী নালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্তনালী (Bile duct, চিত্র, ৩) এবং প্যান্ক্রিয়াসের নালী (Pancreatic duct, চিত্র, ৪) উভয়ে মিলিত হইয়া এই নালীটী গঠিত হইয়াছে। যকৃৎ (Liver) এবং প্যান্ক্রিয়াল্ (Pancreas নামক দুইটী যন্ত্র উদর-গহ্বরের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে যথাক্রমে অবস্থিত আছে। এই দুই যন্ত্র হইতে দুই প্রকার পাচক রস এই নালী বাহিয়া ডিওডিনম্ মধ্যে আগমন করে এবং তথায় পাকাশয় হইতে নির্গত খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাকক্রিয়ার সহায়তা করে। যকৃৎ হইতে যে পাচক রস নিঃসৃত হয়, তাহার নাম পিত্ত (Bile) এবং প্যান্ক্রিয়াস্ হইতে যে রস আসে, তাহাকে প্যান্ক্রিয়াসের রস (Pancreatic juice) কহে। খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার ঘটিত পদার্থ এবং তৈল ঘৃত প্রভৃতি যে সকল চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ থাকে, তাহারা প্যান্ক্রিয়াসের রসসাহায্যে পরিপাক হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মাংস প্রভৃতি পদার্থের পরিপাকও ইহা দ্বারা কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পিত্ত প্যান্ক্রিয়াসের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া মাংস, শ্বেতসার, চর্ব্বি প্রভৃতি সকল প্রকার পদার্থেরই পরিপাকের যথেষ্ট সহায়তা করে। ডিওডিনামের পরেই ক্ষুদ্র অন্ত্রের অপর দুই অংশ—জেজুনম্ (Jejenum) এবং ইলিয়ম্ (Ileum)। জেজুনম্ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫॥০ হাত এবং ইলিয়ম্ ৭॥০ হাত লম্বা। ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাণ্ড আছে, তাহা হইতে এক প্রকার পাচক রস (Succus Entericus) নিঃসৃত হইয়া খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে এবং ভুক্ত পদার্থকে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ কাইল্ (Chyle) নামক এক প্রকার পদার্থে পরিণত করে। ক্ষুদ্র অন্ত্র মধ্যে ভিলাই (Villi) নামক অসংখ্য গুটিকার ন্যায় কোমল পদার্থ অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। ইহারা খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হইয়া যে কাইলে পরিণত হয়, তাহাকে ক্রমাগত শোষণ করিতে থাকে এবং উক্ত শোষিত পদার্থ অপর একটী নালী (Thoracic Duct) বাহিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় ও শরীর পোষণের নিমিত্ত দেহের সর্ব্বাংশে নীত হয়। খাদ্যের অসার অংশ শোষিত না হইয়া বৃহদন্ত্রে আসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে একখানি ঢাকনা আছে, ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে কোন পদার্থ বৃহৎ অন্ত্রে পতিত হইবার সময় ইহা খুলিয়া যায়, কিন্তু বৃহৎ অন্ত্র হইতে কোন পদার্থকে পশ্চাদ্দিকে আসিতে দেয় না। বৃহদন্ত্র (চিত্র, ৭, ৮) দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ হাত এবং পরিসরে ক্ষুদ্র অন্ত্র অপেক্ষা

অনেক বৃহৎ। ইহার মধ্যে অনেকানেক গ্রাণ্ড আছে, তাহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধময় পদার্থ নিঃসারিত হইয়া খাদ্যের অসার অংশকে মলরূপে পরিণত করে; পরে উহা যথাসময়ে মলদ্বার (চিত্র, ৯) দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। এই অসার খাদ্যের মধ্যে যে অত্যল্প সার ও জলীয়াংশ থাকে, তাহা বৃহদন্ত্র দ্বারা শোষিতও হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে বৃত্তাকার মাংসপেশী আছে, তাহারা খাদ্যদ্রব্যের উপর ক্রমাগত আকুঞ্চিত হইয়া উহাকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং এইরূপে মল নির্গমনের সহায়তা করে।

যে কয়খানি চিত্র প্রদর্শিত হইল, কলিকাতা মেডিক্যাল্ স্কুলের সেক্রেটারি বন্ধুবর ডাক্তার আর, জি, কর সেগুলি আমাকে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে চিত্রখানি প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহাও তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই আনুকূল্যের নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীচুনীলাল বসু।

আয়ুর্ব্বেদে পরলোকতত্ত্ব।

প্রাতঃশরণ্য মহর্ষি পুনর্ব্বসু এইরূপভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানবদেহের সাদৃশ্য দর্শাইয়া মানবের প্রকৃত বিশ্বস্তর মূর্ত্তিরই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন,—মহর্ষির এই বিশ্বরূপ বর্ণনার বিষয় চিন্তা করিলে শ্রীমৎভগবৎ গীতা প্রথিত দেবাদিদেব বাসুদেবের সেই বিরাট মূর্ত্তি সন্দর্শনে পরমভক্ত অর্জ্জুন দরদরিতনেত্রে

"বায়ুর্যমোঽগ্নি র্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমোস্তেতু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে" ॥

ইত্যাকার স্তুতিগাথা যাহা উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা স্বতঃই মনে আসিয়া হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া তুলে।

নিখিল জগতের সহিত মানবদেহের এতাদৃশ অভাবনীয় সাদৃশ্য বর্ণনার নিগূঢ় রহস্যের ঝটিতি বোধ না হওয়ায় সংশয়াপন্নভাবে শিষ্য অগ্নিবেশ, পুনরপি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

"এব মেতৎ সর্ব্বসনপবাদং যথোক্তং ভগবতা লোকপুরুষয়োঃ সামান্যং কিং ত্বস্য সামান্যোপ দেশস্য প্রয়োজনমিতি।"

অর্থাৎ ভগবন্! জগতের সহিত মানব দেহের সাদৃশ্য ফলের যাহা যাহা উক্ত হইল তাহা ধ্রুব সত্য সন্দেহ নাই কিন্তু প্রভো! এরূপ সাদৃশ্য বিধায়ক উপদেশে বাক্যের তাৎপর্য্য বা প্রয়োজন কি হইতে পারে? তদুত্তরে মহর্ষি বলিতেছেন,—

অগ্নিবেশ! সর্ব্বলোক মাত্মন্যাত্মানঞ্চ সর্ব্বলোকে সমনুপশ্য-তস্যাত্মবুদ্ধিরুৎপদ্যত্যে ইতি। সর্ব্বলোকং হ্যাত্মনি পশ্যতো ভবিষ্যত্যাত্মৈব সুখদঃখয়োঃ কর্ত্তা নান্য ইতি কর্ম্মাত্মকত্বাচ্চ। হেত্বাদিভিরযুক্তঃ সর্ব্বলোকো ইহমিতি বিদিত্বা জ্ঞানং পূর্ব্ব মুল্যা-স্যতে হপ বর্গায় ইতি"।

চঃ শাঃ ৫ অঃ।

অর্থাৎ—অগ্নিবেশ! এতদ্দ্বারা, এই জাগতিক সাদৃশ্য বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত জগতে আমি এবং সমস্ত জগৎ আমাতে বাস করিতেছে, এইরূপ আত্মজ্ঞান মানবের উদয় হইবে, সর্ব্বলোক আমাতে বাস করিতেছে এরূপ দীব্যদর্শী হইতে পারিলে, আত্মকর্ম্মকৃত সুখ দুঃখের আত্মাই একমাত্র কর্ত্তা অন্য কর্ত্তা নাই এইরূপ বিশিষ্ট জ্ঞানের উদয় হইবে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কোনরূপ হেতু দ্বারা লিপ্ত না হইয়া সর্ব্বলোক স্বরূপ আমি, ইত্যাকার প্রশস্তজ্ঞানের আশ্রয়ে মানব মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। মানবজ্ঞান কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইলে,—কিরূপভাব ধারণ করিলে মানবকে মুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তদুদ্দেশ্যে মহর্ষি বলিতেছেন—

লোকে বিতত মাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি পশ্যতঃ।
পরাবর দৃশঃ শান্তির্জ্ঞান মূলা ন নশ্যতি ॥
পশ্যতঃ সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
ব্রহ্মভূতস্য সংযোগো ন শুদ্ধস্যোপপদ্যতে ॥
নাত্মনঃ কারণাভাবালিঙ্গ মপ্যুপ লভ্যতে।
স সর্ব্ব কারণ ত্যাগান্মুক্ত ইত্যভিধীয়তে ॥

চঃ শাঃ ৫ম অঃ।

অর্থাৎ—যিনি জগৎ আত্মাতে এবং আত্মা জগতে ব্যাপ্ত দেখিতে পান আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত নিখিলদর্শী সেই মানবের জ্ঞানমূলা শান্তি কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। যিনি জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই জগতীস্থ যাবতীয় পদার্থকে সর্ব্বদা দর্শন করিতে থাকেন, সেই বিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মস্বরূপ মহাপুরুষের যোগাবস্থা কখন ভঙ্গ হইতে পারে না এবং তাঁহার সুখ দুঃখ ইচ্ছা অভিলাষ প্রভৃতি কারণ সমূহের অভাব হেতু আত্মার সুখ দুঃখ ইচ্ছা প্রভৃতি চিহ্ন সকলেরও আর উপলব্ধি হয় না, এরূপ অবস্থায় কারণরূপ সকল ভাবের অভাব বশতঃ মানব মুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ভগবান্ অত্রি নন্দনের আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই যোগসাধন ও মোক্ষসাধন মূলক লক্ষণ, আর ধর্ম্মশাস্ত্র বরিষ্ঠ ভগবদগীতা প্রণেতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাংখ্যযোগোক্ত ভক্তি, প্রায়ঃই একার্থ প্রতিপাদক, জগদারাধ্য গদাধর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর ধনঞ্জয়কে বলিতেছেন,—

"সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যোমাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতিঃ॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি সযোগীময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

গীঃ—৬ষ্ঠ অঃ।

অর্থাৎ—হে অর্জ্জুন! যোগাভ্যাস দ্বারা যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়াছেন তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকেন। যে যোগী সর্ব্বত্র আমাকে ও সর্ব্ববস্তু আমাতে দর্শন করেন, তাঁহাকে আর আমার দর্শনে বঞ্চিত ও আমার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না অর্থাৎ তাঁহার সহিত আমার, ও আমার সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। যে যোগী একত্ব অবলম্বনে আমাকে সর্ব্বভূতস্থিত বোধে ভজনা করিয়া থাকেন। তিনি যে কোন অবস্থাতেই থাকুন, আমাতেই অবস্থান করিতেছেন। যে যোগী সুখ দুঃখে আপনার ন্যায় সর্ব্বত্র সমদর্শী তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া অভিমত। ঐশ্বরিক প্রতিভালব্ধ গীতার

বাক্যের সহিত প্রাতঃশরণ্য পূজ্যপাদ পূনর্ব্বসু ঋষির আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরলোকতত্ত্ব বিষয়ের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই এরূপ সামঞ্জস্য আছে। ভগবৎ গীতাকে আদর্শ করিয়া মহর্ষি পুনর্ব্বসু স্বপ্রণীত চরক সংহিতায় এই সকল ধর্ম্মতত্ত্বের সন্নিবেশ করিয়াছেন ইত্যাকার প্রশ্নের যদি কেহ উত্থাপক থাকেন, তবে তাঁহার প্রত্যুত্তরে মাদৃশ ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা এই মাত্র সমাধান হইতে পারে, যে উৎকৃষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমূহের প্রতিভা, একই উদ্দেশ্যে একই পথে অগ্রসর না হইবার বিশেষ কোন হেতু নাই, যাই হোক মহর্ষি এইরূপভাবে মানবের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়া জগতের তাবৎ বস্তুর সহিত মানবদেহের ঘনিষ্টত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃই এইরূপ ঘনিষ্টতা আছে বলিয়াই তরুলতা, উদ্ভিদগুল্ম, ফল মূল, আকরস্থ স্বর্ণ লৌহ হইতে গভীর সমুদ্র গর্ভস্থ মণি মুক্তা শুক্তি প্রবাল প্রভৃতি যত কিছু পদার্থ আছে সকলের সহিতই এই মানব দেহের সাত্ম্যতা (সুখকারিতা) আছে। এই সাত্ম্যতা আছে বলিয়াই মানবের কি আহার্য্যে কি ঔষধে সমুদয় দ্রব্যেরই প্রয়োজন হয়, এবং মানব দেহে আহার্য্য বা ঔষধরূপে আসিয়া উহারা স্ব স্বভাব বিকীর্ণ করত রস রক্তাদিতে পরিণত হইয়া মানবদেহে লয় পাইয়া চৈতন্যাভিমুখী হইতে থাকে, বৃক্ষ যে ফল ধারণ করিতেছে, অথবা পুষ্পে যে মনোহর সৌরভ উদ্গত হইতেছে বৃক্ষ বা পুষ্প তাহার ফল ভোগী নহে সকলই মানবীয় ভাবের পুষ্টিসাধন করিতেছে। সুদূর আকাশ প্রান্তে একটা ধূমকেতু বা গ্রহবিশেষ উদিত হইল দেখিবে তজ্জন্য মানব দেহের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তন্ন তন্ন করিয়া এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় মানব-দেহের সহিত বাহ্যজগতের সকল পদার্থেরই এইরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং সকল পদার্থই এই মানবীয় দেহ যন্ত্রে লয় পাইয়া মানবীয় ভাবের সম্বর্দ্ধনা করিতে করিতে আত্মচৈতন্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জগতে একমাত্র মানবদেহ ব্যতীত আত্ম-চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, মানব ব্যতীত সমুদায় জগৎ অচেতন, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ তরুলতা প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ স্বভাবে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যপ্রণালীর সহিত যোগদান করিতেছে বটে কিন্তু কেহই তাহাদের, স্রষ্টাকে তাহা অবগত নহে কি উপায় দ্বারা কোন শক্তি প্রভাবে তাহাদের ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা তাহারা জানে না,—তাহারা সকলেই অজ্ঞানভাবে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে মাত্র, ঐ যে! ক্রূরপ্রকৃতি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া নিজ ক্রূরতার পরিচয়ের জন্য অপরকে দংশন করিতে উদ্যত হইতেছে, সর্প মনে করিতেছে—সে নিজ শক্তি বলে ঐরূপ করিতেছে, কিন্তু অনন্ত জ্ঞানের প্রেরণায় তাহার ভিতর যে ঐ শক্তি নিহিত রহিয়াছে সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ঐ যে,

বিচিত্রাঙ্গ বনবিহঙ্গটী নিজ সৌন্দর্য্যগর্ব্বে মত্ত হইয়া আনন্দে গাত্রস্ফুরণ করত নাচিয়া কুঁদিয়া মনবের মন মোহিত করিতেছে, পক্ষী বুঝিতেছে না যে, এই দৌন্দর্য্য সম্পত্তি তাহার নিজস্ব নহে, সে কোন্ প্রভাবে কাহার কৃপায় কাহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। কেবল একমাত্র মনুষ্যই এই জ্ঞানের অধিকারী মনুষ্যই বুঝিতেছে যাহার যে শক্তি সম্পৎ বা বিভূতি আছে সে সকলই সেই সর্ব্বনিয়ন্তা বিশ্ব বিধাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইতেছে। মনুষ্যই বিশ্বের শোভা অনুভব করিতে সমর্থ, মনুষ্যই সর্ব্বশক্তির মূলে সেই অনন্ত শক্তিকে অবগত হইতে পারে। মনুষ্যই জগতের যাবতীয় পদার্থ অনুভব করিতে সমর্থ। কেবল উপভোগ বা অনুভব করা নহে মনুষ্য অসীম শক্তি ও জ্ঞান বলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থকেই সাত্ম্যভাবে স্বদেহে পরিণত করিতেও পারগ, এমন কি বিষাদি পদার্থ যাহার সম্পর্ক মাত্রেই প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা, তাহা আমাদের প্রকৃতির পরম অনাত্মীয়,—মানব তাহাকে নিজ শক্তি ও জ্ঞান বলে সুখকর সাত্ম্যতায় আনিয়া অমৃতত্বে পরিণত করিতেছে। উপমান উপমেয় দৃষ্টান্তে ঔষধকে উপলক্ষ্য করিয়া মহর্ষি একস্থলে বলিতেছেন,—

"যথাবিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নি রশনির্যথা।
তথৌষধ মবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত মমৃতং যথা॥"

চঃ সূ

অর্থাৎ—রস, বীর্য্য বিপাকাদিগুণে অপরিজ্ঞাত ঔষধ অযথা প্রযুক্ত হইলে তাহা বিষ অগ্নি, শস্ত্র ও ব্রজের ন্যায় প্রাণ হর হইয়া থাকে কিন্তু সেই ঔষধ যদি রস বীর্য্য বিপাকাদিতে বিজ্ঞাত হইয়া যুক্তিযুক্তভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে অমৃতের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে। উপমান উপমেয়ের পরস্পরের সাধর্ম্ম্য অনুসারে বিষ শস্ত্র, অগ্নি ও অশনি সম্বন্ধেও উক্তরূপ বলা যাইতে পারে স্বভাবতঃ বিষ প্রাণহর হইলে ও যুক্তিযুক্ত ভাবে তাহা ব্যবহৃত হইলে মানবদেহে রাসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে, যে শস্ত্রাঘাতে বা অগ্নিতে অসীম বিপৎ পাতের সম্ভাবনা, সেই শস্ত্র ও অগ্নি যুক্তিযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক মানবের কতই-না ইষ্ট সাধন করিতেছে আর যে যুগে ইলিক্‌ট্রিক ট্রাম, ইলিক্‌ট্রিক আলো, ইলিক্‌ট্রিক বার্ত্তাবহ তাম্রবস্ত্ত ইলিক্‌ট্রিক পাখা প্রভৃতিতে দেশ আচ্ছন্ন ও কলিকাতার প্রত্যেক গৃহই প্রায়ই সুশোভিত যে যুগে মেঘজ্যোতিঃ বা ইরম্মদ কিংবা বিদ্যুৎ যথাযুক্তভাব প্রযুক্ত হইলে মানবের যে কি কার্য্যসাধন না করিতে পারে তাহা বলিতে পারি না, তবে এস্থলে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আর্ষ প্রতিভার

উপর যাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধা সম্পন্ন, তাঁহাদের ভাবা উচিত, অধুনা যে সকল বিষয় নবোদ্ভাবিত ভাবিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া থাকেন, সে সকল বিষয়ের কোনটীই ঋষিজ্ঞানে পূর্ব্বে অবিদিত ছিল না।

ক্রমশঃ—

কবিরাজ শ্রীবারানসীনাথ বৈদ্যরত্ন।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে—একাল ও সেকাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

তীব্রবীর্য্য ঔষধাদির ব্যবহারকে আমরা একালের লোকের স্বাস্থ্যভঙ্গের একটী অতি বিশিষ্ট কারণ বলিয়া মনে করি। ডাক্তারী ঔষধমাত্রই অত্যন্ত উগ্রবীর্য্য ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশবাসিগণের প্রকৃতির বিরোধী। উহা শীতপ্রধান দেশবাসিগণের প্রকৃতির অনুকূল হইলেও, বাঙ্গালিজাতির পক্ষে একান্ত অনিষ্টকর; পরন্ত নানাবিধ উৎকট রোগের কারণ। মানব প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ এতদ্দেশীয়গণের প্রকৃতির অনুকূল এতদ্দেশজাত মৃদুবীর্য্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তৈলজলাভিষিক্ত হিন্দুর দেহোপযোগী ঔষধসংযুক্ত বিবিধপ্রকার ঘৃত তৈলাদি প্রায় সকল রোগেই প্রযুক্ত হইয়াছে। তীব্রগুণ সম্পন্ন ডাক্তারী ঔষধসমূহ আমাদের দেহের উপর অতি শীঘ্র ক্রিয়া করিতে পারে বটে; কিন্তু তাঁহার প্রতিক্রিয়ার ফল অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। যে অশুভক্ষণ হইতে এ দেশে ডাক্তারী ঔষধের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই দেশের লোকের স্বাস্থ্যহানিরও সূত্রপাত হইয়াছে। আজি কালি লোকে রোগ হইবামাত্র অর্থাৎ দূষিত রসাদির পরিপাক হইতে না হইতেই, রাশি রাশি ডাক্তারী ঔষধ খাইয়া, রোগকে আপাততঃ চাপা দিয়া রাখে। অল্পকালের মধ্যেই তাহা ভীষণতর মূর্ত্তিতে তাহাদের দেহে প্রকটিত হয়। আবার রোগের সময় পথ্যাপথ্য সম্বন্ধেও একালের লোকের বড়ই গোলযোগ ঘটিতেছে। যে দেশের লোকেরা প্রতিদিন অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান, অর্দ্ধসিদ্ধ বা আমমাংস ভক্ষণ, দিবা ও রাত্রির মধ্যে অনেকবার ডিম্ব প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্পাচ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া, তৎসমুদয়কে উত্তমরূপে জীর্ণ করিতে সমর্থ হয়, রোগের সময় সেই দেশের লোকেরা যে সকল

সামগ্রী পথ্য করে, আজি কালি এ দেশের দুর্ব্বল পাকস্থালী, শাকান্নভোজী মানবেরা লঘু পথ্য বোধে সেই সকল দ্রব্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেকালের লোকের রোগও হইত, যমের বাড়ীও যাইত বটে; কিন্তু একাল অপেক্ষা সেকালে যে রোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক অল্প ছিল, ইহা অবিসংবাদী সত্য। রোগ হইলে, সেকালের লোকে স্বদেশীয় ঔষধ ও পথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ নীরোগ হইত। সামান্য জ্বর জ্বালা হইলে, অনেকের দুই একটা উপবাস বা সামান্য গাছগাছড়ার রসেই তাহা সারিয়া যাইত। আর একালের লোকের শারীরিক অবস্থার এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, ঐ সকল সামান্য উপায়ে তাহাদের রোগ সারে না। সেকালের "আলুই বড়ী," বিল্বপত্র বা তুলসী পত্রের রসের পরিবর্ত্তে এখনকার শিশুগণকে সূতিকা গৃহ হইতেই ডাক্তারী ঔষধ খাওয়াইতে হয়। একালের শিশুদিগের পিতৃগণের শারীরিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, মাতৃগণের অবস্থাও ততোধিক। একালের জননীরা নানারোগগ্রস্তা, সুতরাং তাঁহাদের দূষিত স্তন্যপানে শিশুগণ সূতিকাগৃহ হইতেই বিবিধ রোগে পীড়িত হয়। তন্মধ্যে শিশুর যকৃদ্ রোগ একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একালে অনেক শিশু যকৃদ্ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। সেকালে এ সকল আপদ বালাই ছিল না।

শারীরিক শ্রম-বিমুখতা প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগে একালের লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। একালের লোকের মানসিক পরিশ্রম বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তত্তুলনায় শারীরিক শ্রম অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত দ্বিবিধ শ্রমের অসামঞ্জস্যে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই যে একালের ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে এত শিরঃপীড়া, অকালে দৃষ্টিহীনতা, যৌবনে বার্দ্ধক্য, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মধুমেহ প্রভৃতি বিবিধ উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। সেকালে ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, সকল শ্রেণীর মধ্যেই ব্যায়ামের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। আমরা বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, তাঁহাদের বাল্যকালে আমাদের দেশের প্রত্যেক ধনীর গৃহেই ব্যায়াম বা কুস্তির আড্ডা ছিল। সেই সকল আড্ডায় ধনিসন্তানগণের সহিত অনেক গৃহস্থের বালকেরা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিত। মধ্যবিত্ত লোকেরা মিলিত হইয়া, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়ামশালা স্থাপন করিতেন। তাহাতে অনেক ইতর লোকেরাও যোগদান করিত। তদ্ভিন্ন সেকালে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই লাঠী খেলার প্রচলন ছিল। লাঠী খেলা না জানিলে, তখনকার লোকেরা সমাজে বিশেষরূপে অপদস্ত হইত। ফলতঃ কুস্তির দ্বারাই হউক, লাঠী খেলার দ্বারাই হউক, অথবা যে কোনও প্রকারেই হউক, সেকালে ইতর ভদ্র সকলেই বিশেষভাবে শারীরিক

পরিশ্রম করিতেন। পরিশ্রম করিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল। রেলপথের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও কিছুমাত্র অপমান বোধ না করিয়া, অনায়াসে ২০।২৫ ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন। তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সেইরূপ আহারও করিতেন। আহার্য্য সামগ্রী পরিপাক করিবার শক্তিও তাঁহাদের যথেষ্টপরিমাণে ছিল। আর এখনকার লোকেরা ক্ষীণজীবী, দুর্ব্বল—এক ক্রোশ পথ হাঁটিবার সামর্থ্য নাই, সামান্য আহার করিলেই, অম্লপিত্ত জন্য বুকজ্বালা করে। উত্তম পরিপাক-শক্তি এখন শতকরা ২।৪ জনেরও আছে কিনা সন্দেহ। সেকালের তুলনায় একালের লোকের শারীরিক ও মানসিক বল ও স্বাস্থ্য সর্ব্বাংশে হীনতর হইয়া পড়িয়াছে।

চরিত্রহীনতা আধুনিক বাঙ্গালিজাতির অঙ্গের ভূষণস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্রের বল না থাকিলে, শরীর ও মনের বল থাকে না। চরিত্রহীন জনের স্বাস্থ্যও কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সেকালের লোকের যেরূপ চরিত্র-বল ছিল, এখনকার লোকের তাহা নাই। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রাদেশের প্রতি অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায়, নিত্যসদনুষ্ঠানসম্পন্ন হিন্দু সন্তানগণের সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ, যাত্রা ও কথকতা প্রভৃতি লোক শিক্ষার বিবিধ উপায়ের দ্বারা সেকালের নরনারীর চরিত্রেকে গঠিত করিবার পক্ষে যে সকল সুযোগ বিদ্যমান ছিল, একালে তৎসমুদয়ের অভাব হওয়ায়, অথবা লোকের ঐ সকল বিষয় হইতেই শিক্ষালাভের প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হওয়ায়, তাহাদের নীতিশিক্ষার পথ ক্রমশঃই রুদ্ধ হইতেছে। স্কুল বা কলেজে ছাত্রগণের নীতিশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকায়, একালের বালক ও যুবকগণ নিতান্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। পিতা মাতা, শিক্ষক বা অন্যান্য গুরুজনকে তাহারা মোটেই গ্রাহ্য করে না। যে সকল বালক পিতা মাতা বা তৎপর্য্যায়স্থ কোনও অভিভাবকের শাসনাধীনে থাকিয়া, স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করে, তাহারা বরং তরুণবয়ঃসুলভ উদ্দাম প্রবৃত্তিনিচয়কে অনেকাংশে সংযত রাখিয়া, স্ব স্ব জীবনকে কোনও প্রকারে নিয়মিত করিয়া লয়; কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত, শিথিলধর্ম্মপ্রবৃত্তি পিতা বা পিতৃব্যগণের আদর্শে তাহাদের চরিত্র যেরূপে গঠিত হইতে থাকে, তাহাতে ধর্ম্মনীতি কোনও ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করে না। সন্ধ্যা ও আহ্নিকাদি বর্জ্জিত, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর বর্ণের সন্তানগণ সন্ধ্যা আহ্নিক বা হিন্দুজনোচিত আচার ব্যবহারের কোনও ধারই ধারে না। আর যে সকল ভদ্রসন্তান বিদেশে, সহরে, স্বগ্রাম ও আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া, স্কুল কলেজের বিদ্যা উপার্জ্জন করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিতান্ত উদ্ধত প্রকৃতি ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে। নিকটে শাসন করিবার

বা নীতিশিক্ষা দিবার কেহ না থাকায়, অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়ে। পল্লীগ্রাম হইতে সহরে নূতন আসিয়া, নানাপ্রকার প্রলোভনের মধ্যে পতিত হইয়া, তাহারা স্ব স্ব চিত্তবৃত্তিকে সংযত রাখিতে একান্ত অক্ষম হয়। যে সকল ছাত্রাবাস বা "মেসে" তাহারা অবস্থিতি করে, সে সকলের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে, সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। বর্ত্তমান প্রস্তাবলেখককে তাঁহার পঠদ্দশায় একজন সমপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে একবার কলিকাতার একটী ছাত্রাবাসে গমন করিতে হইয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, তিনি যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলেন, একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠ মধ্যে ১৫।১৬ জন বালক ও যুবক স্ব স্ব পুস্তক ও তক্তাপোষ বাজাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে নিতান্ত কদর্য্য গীত গান করিতেছে। চরসের ধূমে গৃহ অন্ধকারময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই ঘরেই ছাত্রাবাসের একটী অল্পবয়স্কা কুলটা চাকরাণী স্মিতমুখে বসিয়া আছে। চরসের ধূমে প্রস্তাব-লেখকের মস্তক ঘুরিতেছিল। বাহিরের বারান্দায় উপবেশন করিয়া, তিনি গৃহমধ্যস্থ ঐ সকল বীভৎস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। ফলতঃ তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাড়িখানার সহিত ঐ ছাত্রাবাসের বিশেষ কোনও পার্থক্য অনুভব করিতে পারিলেন না। তদবধি সহরের ছাত্রাবাসসমূহ সম্বন্ধে এই প্রস্তাব-লেখকের হৃদয়ে একটা অতি ঘৃণিত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। কলিকাতার উক্ত ছাত্রাবাসের যে সকল যুবক সে দিন তাদৃশ পৈশাচিক অভিনয়ে মত্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সে বৎসর প্রশংসার সহিত এফ্ এ ও বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পঠদ্দশায় কলিকাতা ও অন্যান্য সহরের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেরই চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত হইয়া থাকে। পরে আবার ইহারাই সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, মান্যগণ্য ও পদস্থ ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি অদ্য-পর্য্যন্ত—প্রায় পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে এই প্রস্তাব-লেখককে স্কুল কলেজের অসংখ্য ছাত্রের প্রমেহ, (গণোরিয়া) ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি নানা রোগের চিকিৎসায় ব্রতী হইতে হইয়াছে। এই যে, আজিকালি প্রত্যেক সহরে বেশ্যার সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের দ্বারাই তাহাদের অধিকাংশের ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এ কালের সকল ছাত্রই যে, ঐ সকল অপরাধে অপরাধী, আমাদের কথার এরূপ কদর্থ যেন কেহ না করেন। তবে একালের বহু লোকেই সেকালের লোকদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে যে নৈতিক অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। চরিত্রবিষয়ে হীনতা ঘটিলে, মানুষের স্বাস্থ্যবিষয়েও হীনতা

ঘটিবে। ভ্রষ্টচরিত্র মানবের দেহ নানা রোগের আকরস্বরূপ। চরিত্রভ্রষ্ট লোক সকল দেশে সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে। তবে জাতীয় অধঃপতনের দিনে উহার সংখ্যা অধিক হয়।

আনন্দ বা মানসিক স্ফূর্ত্তি নামক একটা পদার্থ যেন বঙ্গদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। একালের বাঙ্গালীর মুখ হইতে উচ্চহাস্য আর তেমন নির্গত হইতে দেখা যায় না। আমরা বঙ্গের পূর্ণ দুর্দ্দশার দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদেরই বাল্যকালে দেশে যে আনন্দের স্রোতঃ প্রবাহিত হইত, একালে আর তাহা দেখিতে পাই না। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে পল্লীগ্রামের এক একটী চণ্ডীমণ্ডপ লোকে পরিপূর্ণ,—বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে তাস, পাশা ও সতরঞ্চ খেলায় মত্ত, কোথাও বা গীতবাদ্যের মধুরধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত, কোনও স্থান বা আনন্দ ও হাস্যের উচ্চরোলে নিনাদিত। আর আজিকালি সেই পল্লীগ্রামের দুরবস্থা দেখিলে, অশ্রু সংবরণ করা যায় না। চণ্ডীমণ্ডপগুলি ভগ্নপ্রায় ও দীপপরিশূন্য অন্ধকার। যে সকল গৃহে পূর্ব্বে লোক ধরিত না, আজি সেই সকল গৃহ অনুসন্ধান করিলে, দুই একটী বিধবা স্ত্রীলোক পাওয়া যায় মাত্র। কোনও কোনও গৃহে এক আধজন পুরুষ বাহির হয় বটে; কিন্তু তাহারা রুগ্ন, ম্রিয়মাণ ও আনন্দপরিহীন। আজি তাহাদের মুখে একবারও হাস্য-রেখা প্রকটিত হয় না। সন্ধ্যা হইবামাত্র তাহারা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। রুগ্ন দেহে, ভগ্ন হৃদয়ে তাহারা কোনও প্রকারে দিনপাত করে এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার মহকুমা বা জেলায় গিয়া, তাহারই মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত মামলা মোকদ্দমা করে। তাহাদেরই মধ্যে আবার যাহাদের রক্তের তেজঃ অপেক্ষাকৃত প্রখর আছে, তাহারা মধ্যে মধ্যে ফৌজদারীও করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেক গ্রামের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অবস্থার বর্ণনা করিতে লেখনী কম্পিত হইয়া উঠে। আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ এই তিন মাসের মধ্যে ঐ সকল গ্রামে গমন করিলে, বর্ষীয়ান্ পর্য্যটক দেখিতে পাইবেন, তাহার বাল্যাবস্থায় যে গ্রামকে তিনি আনন্দ উল্লাস, উৎসাহ উৎফুল্লতা, হাস্য ও গীতি-ধ্বনিমুখরিত কত সুখের স্থানরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকল স্থান আজি জনমানবশূন্য,—কোথাও অরণ্য, কোনস্থল শৃগাল কুক্কুরের ক্রীড়াভূমি, কোথাও অজগর ও কালসর্পের বাসস্থান, কোথাও পলায়িত বা ধ্বংসাবশিষ্ট কতিপয় গৃহস্থের মধ্যে পীড়িত ও মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ, কোথাও বা শোকসন্তপ্তজনের হৃদয়বিদারক কাতরধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীগ্রামেরই আজিকালি ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ৮ শারদীয়া পূজার কয়েকদিন প্রবাসপ্রত্যাগত কতিপয় ব্যক্তির

কলরবে গ্রামে মানবের অস্তিত্ব অনুভূত হয় মাত্র। তাহার পর গ্রামগুলি বিরল জন-সঞ্চার অরণ্যবৎ প্রতীত হয়। ৺ পূজার পর হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত, এই মাসত্রয়ে গ্রামগুলি যেন শ্মশানের আকার ধারণ করে। যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা দলে দলে গ্রাম হইতে পলায়নপূর্ব্বক আজি কালি নগরে গিয়া আশ্রয় লইতেছে। আর যাহারা হীনাবস্থ, তাহারা গ্রামে থাকিয়াই, অশেষপ্রকারে লাঞ্ছিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। নগরে পলায়ন করিয়াই বা লোকের নিষ্কৃতি কোথায়? নগরবাসিগণও সহস্র রোগে পীড়িত, তদুপরি জীবনসংগ্রামের কঠোরতায় তাহারা একান্ত জর্জ্জরীভূত। ফলতঃ একালের লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা কোনও কোনও বিষয়ে সুবিধা ঘটিলেও, স্বাস্থ্যবিষয়ে তাহারা যে সেকাল অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে যে কারণে একালের লোকেরা স্বাস্থ্যরত্নে বঞ্চিত হইয়াছে, আমরা যথাসাধ্য তাহার কারণনির্ণয়ে প্রয়াস পাইলাম। যতদূর সম্ভব তাহার প্রতীকারে মনঃসংযোগ না করিলে, বাঙ্গালীর এই অধঃপতনের গতি কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে স্বাস্থ্য বা আরোগ্য। স্বাস্থ্য ভিন্ন জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত।*

কবিরাজ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগে তিতাবড়ী।

নালিতাপাতা চূর্ণ, পুরাতন সিদ্ধিপাতা চূর্ণ ও ইক্ষুগুড় প্রত্যেক সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করত তণ্ডুলোদকের সহিত মর্দ্দন করিয়া বদরিকা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকার অনুপান।—আমাশয়ের সঙ্গে জ্বর থাকিলে তণ্ডুলোদক এবং জ্বর না থাকিলে দধি। দিনে ২।৩ বটিকা সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে সত্বর আমাশয়রোগ বিনষ্ট হয়।

* "স্বাস্থ্যতত্ত্ব—একাল ও সেকাল" সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তিনি সাহিত্য-সভা হইতে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ শর্ম্মা শাস্ত্রি-প্রদত্ত একটি রৌপ্য-পদক পুরস্কার পাইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তদনুসারে সাহিত্য-সভায় অনেকগুলি প্রবন্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলে পরীক্ষায় বর্দ্ধমান রাজবাটীর কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কবিরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং কবিরত্ন মহাশয়ই সাহিত্য-সভা হইতে শাস্ত্রী প্রদত্ত রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোষ্ঠবদ্ধে সুখবিরেচক মোদক।

মনেক্কা অথবা কিস্‌মিস্ ১ তোলা, সোণামুখীর পাতাচূর্ণ ১ তোলা, জাঙ্গী হরিতকী চূর্ণ ½ তোলা ও পরিষ্কৃত ইক্ষুচিনি ১ তোলা, একত্র নির্ম্মল জলের সহিত পেষণ করিয়া ১ তোলা প্রমাণ এক একটী মোদক প্রস্তুত করিবে। রাত্রে আহারান্তে শয়নের পূর্ব্বে এই মোদক একটী জলে গুলিয়া সেবন করিলে পরদিন প্রাতঃকালে ২।৩ বার দাস্ত হইয়া শরীর গ্লানিমুক্ত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়।

শিরঃশূলে।

কেঁওকড়ার স্বরস ও ছাগীদুগ্ধ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে মস্তিষ্কের উত্তাপ জনিত শিরঃশূল আরোগ্য হয়।

হুকার কটু জল স্নানের পূর্ব্বে তৈলের ন্যায় মস্তকে মর্দ্দন করিয়া শৃত শীতল (গরম করিয়া ঠাণ্ডা করা) জলে স্নান করিলে কফজনিত মাথার কামড়ানি নিবারিত হয়।

চক্ষু উঠায়।

বাবলার পাতা ছাগীদুগ্ধের সঙ্গে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্র পুটে রাখিয়া চক্ষে বাঁধিয়া দিলে চক্ষু উঠা দূরীভূত হয়।

প্রসূতীর স্তন দুগ্ধ চক্ষে দিলে স্তন্যপায়ী শিশুর চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়।

বৃশ্চিক দংশনে।

এক মুষ্টি কুল পত্র ১ তোলা আন্দাজ লবণের সহিত দুই হস্তে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবে। একখানি চিম্‌টা দ্বারা এক খণ্ড জ্বলন্ত নির্ধূম অঙ্গার লইয়া তাহার উপর লাগাইয়া দিয়া সেঁক দিতে থাকিবে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ সেঁক দিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বৃশ্চিক বিষের অত্যুৎকট জ্বালা যন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে। ইহা বৃশ্চিক বিষের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গজের কুঠী
পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

কবিরাজ,
শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

ঔষধ প্রস্তুতি ও প্রয়োগ প্রণালী।

মাণিক্য রস।

মাণিক্য রস, রক্ত-দুষ্টি জন্য বিবিধরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ঔষধের নাম মাত্রও উল্লেখ নাই; ঔষধটী ঔষধ রত্নাকর তন্ত্রশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। সংগ্রহকারেরা, কুষ্ঠরোগ—চিকিৎসাধিকারে এই ঔষধের স্থান দিয়াছেন। কিন্তু মাণিক্য রস কেবল কুষ্ঠরোগের ঔষধ নহে, অন্য অনেক রোগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। কুষ্ঠরোগে মাণিক্য রস প্রয়োগ করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, অন্য বহুরোগে তদপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়।

কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা এবং মুখাভ্যন্তরের অন্যান্য স্থানের দুষ্ট পুরাতন ক্ষতরোগে মাণিক্য রস প্রয়োগ করিলে অচিরে নিঃশেষে রোগ আরোগ্য হয়। অন্যান্য বহু প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, যে যে স্থলে সুফল পাওয়া যায় নাই, সেই সেই স্থলে একমাত্র মাণিক্য রস প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

রক্ত দুষ্টি জন্য স্থানিক বা সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষতরোগে মাণিক্য রস সেবন করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। মসূরী অর্থাৎ বসন্ত এবং বিসর্প রোগে শরীরে যে ক্ষত প্রকাশ পায় সেই রোগেও এই ঔষধ মহোপকারী।

একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ পীড়ার মধ্যে পামা-বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি কয়েক প্রকার পীড়া মাণিক্য রস সেবনে প্রশমিত হয় কিন্তু মহাকুষ্ঠে মাণিক্য রসের সুফল আমি কখনই প্রত্যক্ষ করি নাই।

বাতরক্ত রোগে মাণিক্য রস সেবন করিলে জ্বালা যন্ত্রণা প্রশমিত হয়, রোগেরও উপকার করে। দীর্ঘকাল এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অনেকে বাতরক্ত জন্য স্ফুটিত পাদ রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

জ্বররোগে রক্ত দুষ্টি জন্য যখন কণ্ডু প্রভৃতি নানা প্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়, তখন মাণিক্য রস সেবন করাইলে বিশেষ উপকার লাভ হয়। এই ঔষধের প্রভাবে কণ্ডু প্রভৃতি এবং জ্বর প্রশমিত হয়।

অনেক সুচিকিৎসক জ্বর শান্তির জন্য এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া নামক জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। ডাক্তারি ঔষধ লাইকার আর্সিনিক্ নামক ঔষধ অপেক্ষা মাণিক্য রসের জরঘ্ন শক্তি কোন অংশে ন্যূন নহে।

প্রস্তুতি-প্রণালী।

বংশপত্র হরিতাল, যাহা বাঁশ পাতা হরিতাল নামে প্রসিদ্ধ, ধারাল জাঁতি দিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া লইবে। কিঞ্চিদধিক ।৵৹ আধ পোয়া সেই ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকৃতি হরিতাল একখানি উপযুক্ত প্রস্তর, বা কাচ অথবা মৃত্তিকা ভাজনে রাখিয়া, হরিতাল ডুবিয়া যায় এরূপ পরিমিত কুমুড়ার জল দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। জল নিঃশেষে শুকাইয়া গেলে আবার হরিতাল কুমুড়ার জলে ডুবাইয়া রৌদ্রে রাখিবে। এইরূপে সাতবার জল দেওয়া ও শুকান হইলে, অম্ল দধির ভাবনাও সাতবার দিতে হইবে। যে পরিমিত অম্ল দধিতে হরিতাল মগ্ন হয় প্রত্যেক বারই সেই পরিমাণের দধি দিতে হয়। সাতবার টক্ দইএর ভাবনা দেওয়া হইলে পরিষ্কার জলে হরিতাল পুনঃ পুনঃ ধুইয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে।

তারপর একটী নূতন হাঁড়ীর তলদেশে একখণ্ড পুরু সাদা অভ্র স্থাপন করিবে। অভ্র খণ্ড কাচি দিয়া ছাটিয়া গোলাকার করিয়া লইতে হইবে। স্থালীর তলদেশে স্থাপিত অভ্রের উপরিতন ভাগে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাবিত, ধৌত এবং শুষ্কীকৃত হরিতাল পাতাইয়া দিবে এবং তদুপরি তিন চারি খানি অপেক্ষাকৃত পাতলা সাদা অভ্র বিন্যাস করিয়া উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিতে হইবে।

পুনরপি, সেই অভ্র দ্বারা আচ্ছাদিত হরিতাল একখানি উপযুক্ত শরাব দিয়া আচ্ছাদন করিবে। কুলের পাতা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, তাহা দিয়া শরাব ও হাঁড়ীর সন্ধিস্থল বেশ করিয়া লেপ দিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করত কাঠের জালে পাক করিবে।

সে সময়ে হাঁড়ীর তলদেশ খুব লাল হইবে, লেপটী পুড়িয়া সাদা ছাই হইয়া যাইবে এবং শরাবের পার্শ্ব দিয়া ধূম নির্গত হওয়া বন্ধ হইবে তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিবে। জুড়াইয়া গেলে শরাব উঠাইয়া অভ্র লগ্ন মাণিক্যের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে।

মাণিক্য রসের মাত্রা ২ রতি। গব্য ঘৃত ।• এক শিকি এবং মধু আধ তোলা দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে হয়। জ্বরে মধু দিয়া সেবন করিতে দিবে।

স্বর্ণ ভস্ম।

স্বর্ণ স্বয়ং একটী মহৌষধ এবং নানারোগের অনেক প্রকার ঔষধের একটী বিশিষ্ট উপাদান। স্বর্ণ ভস্মীভূত না হইলে কোন কাজে আসে না, অসম্যক্ ভস্মীভূত স্বর্ণ সেবন করিলে মলের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। তজ্জন্য স্বর্ণকে ভাল করিয়া জারিয়া লইয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিতে হয়। সুজীর্ণ অর্থাৎ ভাল জারা সোণা নাড়ীর ছিদ্র পথ দিয়া সংক্রমণ

করত রক্তগত হইয়া স্বকীয় গুণ বীর্য্য প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় সুতরাং শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে স্বর্ণকে সুজীর্ণ করিয়া ঔষধের উপাদানের কাজে ব্যবহার করা উচিত।

ঔষধের কাজে বিশুদ্ধ স্বর্ণ ব্যবহার করিতে হয়। যে স্বর্ণে অন্য কোন ধাতুর খাদ না থাকে তাহাই বিশুদ্ধ স্বর্ণ। অনেকে পুরাতন মোহর জারিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা উচিত নহে, বিশুদ্ধ সোণায় কিছু খা'দ না দিলে মুদ্রা তৈয়ার হয় না। ষ্টাণ্ডার্ড গোল্ড খাটি সোণা। তুই ছাপ দেওয়া চীনার পান্নাও বিশুদ্ধ স্বর্ণ ধাতু। সুতরাং জারিবার জন্য চীনের পান্না ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সোণা জারিবার আগে পিটিয়া পিটিয়া খুব পাতলা পাত তৈয়ার করিয়া লইতে হয়, চীনের পান্নার ন্যায় পাতলা পাত করা সহজ নহে তজ্জন্য জারণকার্য্যে চীনের পান্না ব্যবহার করাই সুবিধা।

সর্ব্বাদৌ সোণার পাত শোধন করিয়া লইতে হয়, তাহার ক্রম এইরূপ—

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মৃত্তিকা বা অন্য কোন অধাতব ভাজনে, আবশ্যকানুরূপ তিল তৈল, ঘোল, গাইগরুর চোণা, কাঁজি এবং কুলথ অর্থাৎ কুল্‌থি কলাইয়ের কাথ সাজাইয়া রাখিবে। তারপর কাঠের কুয়লার আগুনে সোণার পাত পোড়াইয়া প্রত্যেক ... ক্রমান্বয়ে সাত সাত বার ফেলিবে। তদনন্তর উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইবে।

শোধন করার পর শোধিত স্বর্ণ পত্র ধারাল কাঁচি বা কাতুরি দিয়া খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া লইতে হইবে। তারপর যতটুকু সোণা জারিবার জন্য লওয়া হইয়াছে তাহার দুইগুণ শোধন করা পারা ওজন করিয়া লইবে। একখানি সুদৃঢ় পাথরের খলে সোণা রাখিয়া তাহাতে পারা দিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লেবু বা আমরুলির রস দিয়া উপযুক্ত নুড়ি দ্বারা বহুক্ষণ মাড়িবে। মাড়িতে মাড়িতে যখন সোণার সত্বা উপলব্ধি করা যাইবে না, সোণায় পারায় মিশিয়া যাইবে তখন নির্ম্মল জলে পুনঃ পুনঃ ধুইয়া নির্ম্মল করত শুকাইয়া লইবে।

ইহার পর, সোণায় পারায় যতটুকু ওজন হইয়াছে ততটুকু গন্ধক দিয়া ... মাড়িতে হইবে। সেই কজ্জলীভূত দ্রব্যে ঘৃতকুমারীর স্বরস দিয়া মাড়িয়া ... গোলক বাঁধিবে। সেই গোলক উপযুক্ত মুষার মধ্যে রাখিয়া আচ্ছাদন করত আঠাল মাটীর এক অঙ্গুলি পুরু লেপ দিয়া শুকাইয়া লইবে। লেপ দেওয়া মুষাটী গজপুটে পাক করিতে হইবে। এইরূপে চৌদ্দবার পোড়াইয়া লইলে স্বর্ণ ভস্ম হয়।

সম্পাদক।